মনই সৃষ্টির উৎস

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১০ই আষাঢ়, ১৪১৬ ২৫শে জুন, ২০০৯

মুদ্রণ মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in

Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

অনন্ত জীবনের যাত্রাপথে আমরা সবাই বিরাটের বিরাট সত্তার সাথে একই সত্তায় যুক্ত হয়ে রয়েছি। তবুও আমাদের মন দিবারাত্র ঝড়ো বাতাসের মত মাতামাতি করছে। মনের এই যে বহুমুখী গতি, মনের এই যে উথাল-পাথাল অবস্থা, এটা তার (মনের) বিক্ষিপ্ততা নয়, ব্যাপকতারই পরিচয়। বিশ্বরূপের প্রতিটি রূপ, সে যে মনেরই রূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রতিটি বস্তুর মাঝে মনেরই প্রকাশ। যে আদি সুর থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই সুরকে আপন আপন সুরে আনার জন্যই মনের এই আলোড়ন। নিজের মাঝে নিজে তন্ময় হয়ে মহাশূন্যের ধ্যানে এই বিরাট মনকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তখনই যার যার ভিতরকার সহজাত শক্তি আপনি জেগে উঠবে। সেই আদিসুরকে সুরে আনা তখনই সম্ভব হবে।

আমাদের শাস্ত্রে গ্রন্থে সাধু গুরু, ঋষি মহানরা মন সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন, অনেক আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন। যেমন— মন বিক্ষিপ্ত, মন চঞ্চল, মনকে স্থির (control) কর, মন না বসলে কোন কাজ সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। মন এত বিরাট, মনের গতি এত প্রচণ্ড যে, সে (মন) এক পলকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে চলে যাচ্ছে। তার চলার পথে আগুন, জল, বাতাস কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না; সেই মনকে কি কোন উপদেশ, কোন আখ্যায় ব্যাখ্যায় সীমার বাঁধনে বেঁধে রাখা যায়? মন চঞ্চল, মন বিক্ষিপ্ত, মন উড়ো উড়ো — এগুলি কোন কথা নয়, মনের বহুমুখী শক্তিরই প্রকাশ। মনের সাহস অসীম। মন মনে মনে যা খুশী তাই করতে পারে। কে রাজা, কে লাটসাহেব কাউকে সে পরোয়া করে না। মনে মনে যারে যা খুশী তাই বলতে পারে।

মনকে যতই কন্ট্রোলে রাখতে চেষ্টা করা যাক না কেন, কখনও কন্ট্রোল করতে পারা যায় না। মনের শক্তি এত বিশাল, এত বিরাট যে কোন কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। মনের কাছে আমাদের এই সংসারের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, শান্তি-অশান্তি ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলো এক বিন্দু জলও নয়। যা বিরাট, যা ব্যাপক, তা কখনও সম্পূর্ণরূপে এখানকার (সংসারের) টাকা-পয়সা, গাড়ী বাড়ী, প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় না। তাই কোন কিছুতেই মনের তৃপ্তি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে উপযুক্ত খোরাক না দেওয়া যায়।

আকাশে বাতাসে কত ধূলিকণা উড়ছে, কত অজস্র জীবাণু ভাসছে, কত দুর্গন্ধ কত সুগন্ধ বের হচ্ছে। আবার সেই বাতাসই অনন্ত জীবলোককে বাঁচিয়ে রেখেছে। তেমনি আমাদের মনে কত শয়তানি, ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা আছে, হতাশা-নিরাশা আছে। আবার কত ভাল মন্দ ভাব খেলে যাচ্ছে সেখানে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই, যা মনের মাঝে উদয় হয় না। এত কিছু মনের মাঝে রয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন, 'মন এত বিক্ষিপ্ত,' 'এত চঞ্চল।' কিন্তু এটা মনের বিক্ষিপ্ততা নয়, চঞ্চলতা নয়, এটা মনের প্রসারতা। আলো, বাতাস প্রভৃতি উড়ো বস্তু দিয়েই মন তৈরী। তাই মন সবসময় উড়ে বেড়ায়। মনের মধ্যে সেইজন্য নানারকম চিন্তা আসবেই। আজে বাজে, ভাল-মন্দ সব রকম চিন্তাই আসবে। এটাই স্বাভাবিক। তবে মননের মাধ্যমে মনের দৃঢ়তা বা আত্মবিশ্বাস বাড়ানো সম্ভব। ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্নিহিত মনের শক্তিকে জাগাতে হবে। তখনই মন তার মনের মত খোরাক পেয়ে তৃপ্তিবোধ করবে।

যে আদিশক্তি দ্বারা, যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে একের পর এক সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তার আদি হচ্ছে মন। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী — এই পরিদৃশ্যমান জীবজগত মনন শক্তির সাথে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, আলাদাভাবে খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ জীবজগতের প্রতি অণুতে পরমাণুতে, প্রতি বিষয়বস্তুতে মন বিদ্যমান। মন হচ্ছে এক্সরে যন্ত্রের মতো। যেমন চিন্তা করা হয়, সেই চিন্তা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। কিন্তু সংস্কারের চাপে আমাদের স্বচ্ছ মনকে আজ আমরা পঙ্গু করে ফেলেছি। শত সহস্র কোটি জীবের শত সহস্রকোটি রূপ, মনন শক্তিরই রূপ। মনের স্ফূরণেই সবকিছুর সৃষ্টি। মনই হচ্ছে মন্ত্রশক্তি, মনই হচ্ছে সপ্তচক্র। আবার মন হচ্ছে যার যার আরাধ্য দেবতা। তাই মনই স্রষ্টা, মনই ভগবান। মনন আকারে স্রষ্টা স্বয়ং সবার মাঝে নির্বিকল্প অবস্থায় গভীর সমাধিতে সমাহিত হয়ে আছেন।

মনন শক্তির স্ফুরণের দ্বারা জীব যাতে অনন্ত শক্তির অধিকারী হতে পারে, তার জন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনে'র উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে 'অভিনব দর্শন প্রকাশনে'র ২৫-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **'মনই সৃষ্টির উৎস'**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬ — *চপল মিত্র*

ইং ২৫শে জুন, ২০০৯ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

মনের চিন্তাতে মনের মাত্রাতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতে নানা রূপের সৃষ্টি

২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৩
রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা

চিন্তার সাথে সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে স্তরে মনের মাত্রা উঠে যায়; ১০০ মাত্রা থেকে ১০০০ মাত্রা হয়ে যায়। প্রতিদিন এইরূপ হতে হতে একশো মাত্রা আর এক হাজার মাত্রা বাপের বাড়ী আর শ্বশুর বাড়ী হয়ে যায়। তারপর ১০০০ মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রা হয়ে ১০০ মাত্রার ন্যায় দাঁড়ায়।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির মাঝে চলেছে শুধু রূপের খেলা। যেদিকে তাকাই শুধু রূপের পর রূপ। রূপে রূপে পরিবর্ত্তনের মাঝেই চলেছে এই সৃষ্টির ধারা। **এক একজনের মনের তাগিদে তাগিদে এক একরকম চেহারা, এক একরকম রূপ হয়ে যায়। মনের চিন্তাতে মনের মাত্রাতেই নানারূপ বক, সারস, জিরাফ ইত্যাদি। চাওয়া আর মনেতে এক হলেই সফলতা আসে।** কোন 'কিন্তু', কোন দ্বন্দ্ব থাকলে হবে না। কিন্তুবিহীন মনে যা চাইবে, তাই হবে। স্বপ্নে অনেকে মহাপুরুষের ক্ষমতা অর্জন করে। স্বপ্নে শূন্যের মধ্য দিয়ে যাই, জলের উপর দিয়ে যাই। জাগরণে কেন পারি না? স্বপ্নের উঠে যাওয়া মনের মাত্রাকে জোর করে রেখে দিলে, জাগরণেও সফল হওয়া যায়। এক মহাপুরুষ তার ভক্তকে জাগরণে মনের মাত্রা রক্ষা করার কথা বললেন। ভক্ত সমর্থ হলো। কিন্তু তার স্ত্রী ভয় পেয়ে যাওয়াতে সে নেমে গেল। স্বপ্নের মাধ্যমে কার্যকলাপ দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, চিন্তার প্রখরতায় মনের মাত্রাটা ধরে রাখতে পারলে, প্রতিটি কার্যই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে। স্বপ্নের

বিষয়বস্তুর মাঝে অনেক কিছুরই সামঞ্জস্য থাকে না। স্বপ্নের বিষয় যে ঘটবেই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। স্বপ্নে একজন জ্যোতি দেখতো। স্বপ্নের পদ্ধতি মনে করে, জাগরণেও সে সেই জায়গায় জ্যোতি চিন্তা করতে লাগলো। অবশেষে সফল হলো। স্বপ্নে ও জাগরণে যদি একই চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারে, তবে ১ লক্ষ বছরের কাজ ১ সেকেন্ডে হতে পারে। আর হতে পারে এইরূপ সঙ্গতে।

২০০০ হাজার বছর ধরে এক বাড়ীতে গান বাজনা হয়ে আসছে। সমস্ত লোকই মরে গেছে সেই বাড়ীর। তবুও আশেপাশের সবাই সেই বাড়ী থেকে গান ও সুর শুনতে পায়। কিন্তু লোক আর বের হয় না সেই বাড়ী হতে। আশ্চর্য হয়ে কয়েকজন খোঁজ করতে বের হলো। সেখানে একজন সমাধিস্থ ছিল। সে বললো, 'আমার সাধনা এখনও চলেছে।

সবাই জিজ্ঞাসা করে, এই বাড়ী হতে গান ও সুর শোনা যায় কি করে?

সে উত্তর দেয়, ২০০০ বছর ধরে গান হতে হতে এই বাড়ীর ইট, চুণ, বালি, গাঁথনি সব সুরে সুরে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। একটা পিনের খোঁচায় একটা থালায় (রেকর্ডে) কত গান বের হয়। তবে একটা বাড়ী হতে সুর বের হবে না কেন?

তোমরা এইরূপ সঙ্গত করতে করতে থালার (রেকর্ডের) মত হলে মনরূপ পিন বসালেই সব সুর আপনি বেজে উঠবে। আমার (শ্রীশ্রী ঠাকুরের) উপদেশের সুরের সাথে তোমার সুর এক হয়ে যাবে। সঙ্গত মানে যোগ। সেই যোগাযোগে যুক্ত হলে তোমার সাথে মিশে এক বস্তু করে নিয়ে যায়।

চিন্তার শক্তি অসীম। চিন্তায় কিভাবে কি হয়? দ্বিদলের (আজ্ঞাচক্রে, দুই ভ্রূর মাঝখানে) এক এক স্তরে চিন্তা করলে এক এক জাতীয় জিনিস পাওয়া যায়। যেমন তাপে তপ্ত লোহা গলে জলের মত হয়, চিন্তা করলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুণগুলি আয়ত্তে আসে। এত সূক্ষ্ম বস্তু,

যা দেওয়াল ভেদ করে চলে যেতে পারে, চিন্তার সাথে সাথে মনও চলে যায়। চিন্তায় কোথাও (চন্দ্রে, সূর্যে) যেতে ১ সেকেন্ড লাগে না। দেহের ন্যায় মন যার ভিতর দিয়ে দৌড়ায়, সেই যে বস্তু, যাওয়ার যে পথ বা পাত্র, তার গতিতে বলার সাথে সাথে মননের সাথে সাথেই যাওয়ার কাজটি হয়ে যায়। এত যে দ্রুতগতি, সেই বস্তু কত সূক্ষ্ম বুঝতেই পারছো। আলোর speed, আলোর গতি কত বেশী। কিন্তু মনের গতির নিকট কিছুই না। কাজেই তোমার মনের সাথে সাথে তোমার দেহেও সেইরূপ সূক্ষ্ম বস্তু আছে। চিন্তার সাথে সাথে, মনের দ্রুতগতির সাথে সাথে সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপ্তমান মন আরও ব্যাপকতার সুরে ছড়িয়ে যায়। মনের যে ঘোড়া, সে চায়, দেহের সমস্ত সূক্ষ্মবস্তুগুলিকে আস্তে আস্তে চেষ্টা করে করে, স্পর্শ করে করে, আনুষঙ্গিক সবাইকে ওর মত করে নিতে।

ইটের চেয়ে বুলেটের আঘাতে ব্যথা বেশী। বারুদ হচ্ছে মন। চিন্তাকে যদি দ্বিদলে বসাও, সে চাইছে ঐ সূক্ষ্মের ভিতরে মন দিতে হবে। মনের তাপে তাপে স্থূলও তখন সূক্ষ্ম হয়ে যাবে। ঐ জাতীয় স্তরে পৌঁছেই, আবার তোমার এখানকার মতো অবস্থার কথাই মনে হবে। ঠিক 'আজ নগদ কাল বাকী'র ন্যায়। আবার সেখানে গিয়েও ঐ দ্বিদল, ঐ মন। আবার উঠলে, আবার আরম্ভ। এইভাবেই চলছে সাধনার ধারা। তা সত্ত্বেও মনে হয়, তোমার হচ্ছে না। অসীমের খেলা কি না। পূর্ণের মাঝে সদাই শূন্যের সুর বাজে। তবুও যদি জিজ্ঞাসা করো, 'তবে কি মুক্তি হলো না?' 'মুক্তি' তখন বাড়ীর ছাগল হয়ে থাকবে।

দেশ আবর্জনাময়। ওস্তাদ (বৈজ্ঞানিক) আবার আবর্জনা দিয়েই gas light তৈরী করেন। রূপ নিয়েই এখন গণ্ডগোল। চিন্তাধারাতেই অবস্থাভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ বের হচ্ছে। ছোটবেলায় সাড়ে ছয়/সাত বছর বয়সে তুলসীপাতা চিন্তা করতে করতে তুলসীর বন এসে হাজির। সেইরূপ গাঁদা, গন্ধরাজ ইত্যাদি যা যা ফুল চিন্তা করতাম, তাই এসে হাজির হতো। ছেলেপুলেরা বলতো, কাঁঠালের গন্ধ চাই। তাই হতো। রোগী, দুঃখী আসতে আরম্ভ করলো। হাতের স্পর্শেই রোগ চলে গেল।

কেন গেল, কিভাবে গেল, বুঝি নাই। কলম ছুঁড়ে ঠিক দোয়াতের মুখে ফেলি। পূর্বদিকে স্কুলে seat ছিল, মার খেয়ে পশ্চিমে বসি। একদিন নামতা মুখস্থ বলতে না পারার জন্য একজনকে kneel down করালো। পরের দিন আমাকে বলতে হবে, মাষ্টার মশায় বলে দিল। অন্যে শিখেছে। ভাবলাম, আমিও শিখেছি। এই ভেবে স্কুলে গেলাম। পড়া আর বলতে পারি না। বেত পিঠে পড়ে পড়ে এমন অবস্থা। বেতের মধ্যে দিলাম 'মন'। দু'বার বলতে বেত আটকে গেল। হাতে শ্লেট ছিল, সেটা দিয়ে মারবে, তাও আটকে গেল। চটি জুতা ছুঁড়বে, তাও আটকা পড়লো। মাষ্টার মশায়ের অবস্থা একেবারে গৌরাঙ্গ। পরে অবশ্য ঠিক করে দিলাম।

চিন্তার জন্য মূর্ত্তি ঠিক করলাম 'গণেশ'। **ঔষধের গুণে যদি দেহের রূপ ফটোতে ওঠে, সেরূপ চিন্তাতে আসল রূপের অনুরূপ রূপ তৈরী হয়; অর্থাৎ যে মূর্ত্তি চিন্তা করা যায়, তাই দেখা যায়। চিন্তার সাথে সাথেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি হচ্ছে পিতাপুত্রের সম্পর্কের মতো।** বাপ যেমন ছেলেকে সৎপরামর্শ দেয়, ঠিক সেই সম্পর্কের মতো। এই ধারাই চলেছে ধরাতে।

গণেশের চিন্তা করতে করতে গণেশের রূপ দেখি। পরে আবার নিজের চিন্তা যখন করি, আমার খেলাই আমি দেখি। বাচ্চারা আসে। খেলা করে। যেদিকে যাই দেখি, আমারই রূপ খুঁজে পাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তুমি যার ভিতর যা খুঁজছো, তোমার ভিতর তাই দেখছো। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি তুমি; আবার জল, বাতাস, তাপ ইত্যাদিও তুমি। বাতাস ছাড়া চলতে পার না। জল ছাড়া চলতে পার না। তাপ ছাড়া চলতে পার না। কাজেই জল, বাতাস, তাপ সবই তোমার অঙ্গ। চিবিয়ে চিবিয়ে আমারে খাই। চিবিয়ে চিবিয়ে আমারে ফেলি। অভ্যাস হয়ে গেলে আর অসুবিধা হয় না। **আনন্দের কোন দিক দিয়ে যে কার কি রূপ, বলা যায় না। যেমন ডোমের আনন্দ মড়া দেখে।** জল, তেল ঠিকই মেশে; তবুও যেন আলাদা। সেইরূপ সর্ব-অবস্থার মাঝে আমি। আবার সর্ব অবস্থা হতেই আমি পৃথক হয়ে আছি।

পরিবেষ্টনী হতেই অসম্ভব, অবাস্তব, আশ্চর্য 'হতে পারে না', ইত্যাদির উদ্ভব। চীনদেশে একজন চীনভাষা শিখতে সাধনা করছেন, তুমি বাঙ্গালী শুনে হাসছো। অন্তর্যামিত্ব, অনিমা, লঘিমা, সর্বদর্শী, সর্বব্যাপ্তমান ইত্যাদির মর্মার্থ বা মর্ম যারা বোঝে না, তাদের কাছে এসবের কোন মূল্যই নেই। তারা এসব নিয়ে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস করে। অন্যদেশের আবহাওয়ায় অর্থাৎ পশ্চিমের দেশে ইহাই স্বাভাবিক। সেইদেশের শিশুরা সেইভাবেই গড়ে উঠেছে। পরদেশী ভাষা শিখতে গেলে দরকার এই সঙ্গত। বাঙালী শিশুকে লণ্ডনে রেখে দিলে ইংরেজী বলতে পারে গড়গড়িয়ে। সেইরূপ সঙ্গত (যোগাযোগ) করলে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কোনও জিনিস তখন অসম্ভব বলে মনে হবে না।

Work; বীজমন্ত্র জপ করে যাও। Silence, মন্ত্র জপ করো। চেষ্টা করো। পার হয়ে এসো। আর একটু এসো। আর একটু একটু করে এগিয়ে এসো। পিছলিয়ে যেও না। তবেই সফলতা অনিবার্য।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

যার মন যত বেশী বিক্ষিপ্ত সে তত বেশী বিরাটের সুরে রয়েছে

২৬শে আগষ্ট, ১৯৫৩
পুরী

জীব মুক্ত হয়েই আসে। নিজেদের কর্মদোষে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। এক একজনের এক এক ব্যাপারে গরমিল হয়ে যায়। মন বসে না, মন চঞ্চল— এ কি শুধুই কর্মদোষ? তাও ঠিক নয়। **মনে যে বিক্ষিপ্ততা বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, অযথা ব্যাঘাত এসে ধ্যানধারণা বা জপ সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে, তখনই বেজে ওঠে একই সুর, মন বসছে না, ধ্যান হচ্ছে না।** সংসারের নানা আবিলতা, ঝামেলার ফলে সবারই এমন হতে পারে। মন বসে না। কেন বসে না? কারণ কি?

জমিতে কৃষক বীজ বপন করে যাচ্ছে। ধর, সরিষার বীজ বপন করা হল, দেখা গেল, নানান গাছ এবং বহু আগাছাও জন্মেছে। তাতে কি? ফুলও ঠিক হয়, ফলও ঠিক হয়। মন যে বসে না, তা শুধু কর্মদোষ নয় বা দুর্ভাগ্য নয়। যে মন তোমাদের রয়েছে, সৃষ্টির আদি হতেই এই মন এরূপ বিক্ষিপ্ত ছিল, আজও সেরূপ রয়েছে। তোমাদের ভিতর যদি সৃষ্টির সেই সুর থাকে, সেই মন সেদিন যদি স্রষ্টার ক্ষমতা নিয়ে বিরাট হয়ে থাকে, তবে তোমাদের যে মন সেদিন যেরূপ ছিল, আজও সেইরূপই আছে।

প্রশ্ন হতে পারে, মন যদি স্রষ্টার ক্ষমতা নিয়ে থাকে, তবে কোথায় তাঁর অন্তর্যামিত্ব, সর্বব্যাপ্তমানতা ও সর্বশক্তির প্রকাশ? ইহা যে নেই, সেটা যে বুঝতে পারছো, তখন বুঝতে হবে, তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ যে জিনিস বুঝতে পার না, তা বুঝবার প্রচেষ্টায়। ইহা কম কথা নয়। সাধনাও এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না, আর তা বুঝতে যাচ্ছি। ইহা যে বুঝতে পারছি, ইহাতেই শব্দ হয়ে গেল। সেই শব্দই হল বীজ অর্থাৎ মূলমন্ত্র। ইহা জপ করলে সব বাধা সরে যায়। এই জপের

মাধ্যমে আমরা অবুঝগুলোর দিকে অস্ত্র চালিয়ে যাচ্ছি, plain (সোজা) রাস্তা করে সব বাধা সরিয়ে। এই রাস্তা হল জ্ঞানের রাস্তা (যেমন G.T. Road); বিবেক, বিচার, বুদ্ধি সব রয়েছে এতে। যে বুঝগুলো অবুঝের খাতায় ছিল, তা বুঝতে বুঝতে যাচ্ছ। রাস্তা যত বড়, কর্মচারী তত বেশী। মন যত বড়, কর্মচারীর সংখ্যাও সেরূপ। **যে যত (যার মন) বেশী বিক্ষিপ্ত, সে তত বেশী বিরাটের সুরে রয়েছে, সে তত খাঁটি।**

Expert typist বহু আলাপ করে যায়, গল্প করে যায় machine চালানোর সাথে সাথে, কারণ সে ততবেশী চিন্তা করতে পারে। একটা ইলিশের এক লক্ষ বাচ্চা সবাইকে ঠিক রাখে, ঠিক পাশে পাশে রাখে। এক বাপের এক ছেলে, দুই ছেলে, তিন ছেলে হলে তাদের যেভাবে দেখে, যেরূপে রাখে, ইলিশ মাছ সেইরূপ একলক্ষ বাচ্চাকে দেখে। এতগুলো চঞ্চল মন নিয়ে সে যদি বুঝতে পারে, তবে বুঝতে হবে, সে খাঁটি আছে। এদিক ওদিক, সেকথা, একথা সব ভেবে ভেবে চিড়িয়াখানার জীব হলে, তারপর দেখলে ভাবনার আর কুলকিনারা নাই। তখন আবার জপে বসলে ধপ্ করে নেমে। এইভাবে যতবেশী চিন্তা করবে, যতবেশী 'ধপ্' করতে পারবে, বুঝতে হবে, ততবেশী গাঁথুনি পাকা হচ্ছে। যতবেশী ডলবে, ততবেশী খাস্তা অমৃত। সব কিন্তু এক লাইনের। সব কিন্তু এক লাইনেই আছে। মনও সেরূপ এক লাইনেই আছে। যতই ঘুরাও না কেন, মনরূপ সাগর আর বিরাট মহাসাগর মিলিয়েই আছে। খাল দিয়ে চলছো আঁকাবাঁকা রাস্তায়। **বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে canal এর মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলেছো মহাসাগরের সান্নিধ্যে। শুধু এই চিন্তা করবে, মন তুমি যত ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও, উদ্দেশ্য শুধু জপ।**

বিন্দুকে কেন্দ্র করে, একটি বিন্দু ঘুরতে যত সময়ের দরকার, ২৫,০০০ মাইল ঘুরতেও একই সময় লাগে। **যদি একটি সরিষা আর পৃথিবী একই সূত্রে গাঁথা থাকে, তবে চিন্তার সাথে সাথে মননের সাথে সাথে পৃথিবী পরিক্রমা হয়ে যায়।** এই একই সূত্রে গাঁথা থাকা চাই। শব্দের সঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে তোমাদের connection. সেই ব্রহ্মের সঙ্গে আর মূলের সঙ্গে কে যোগাযোগ করছে? চিন্তার সাহায্যে, ধ্যান ও জপের সাহায্যে এই যোগাযোগের যোগসূত্র রচিত হয়ে চলেছে। **যত তুমি**

শব্দকে মূলমন্ত্রকে আওড়িয়ে যাচ্ছ, ব্রহ্মাণ্ডকে ততবেশী নাড়ছো। মুষ্টিযোগ একেই বলে অর্থাৎ কুম্ভক, রেচক, পূরক, প্রাণায়াম হয়ে যাচ্ছে। পিণ্ড চটকালে যেমন পণ্ডিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডকে যত বেশী চটকাবে, জমে যাবে তোমার ভিতর।

এতটুকু একটা stone দিয়ে সব দেখতে পারলে, সরিষার মত অণুতুল্য মন্ত্রদ্বারা কেন পারা যাবে না? শাহজাহান আগ্রায় বসে মমতাজকে দেখতো এতটুকু একটা stone (পাথর) দিয়ে। সমস্ত তাজমহল ঘুরতে হয় না, যদি এইরূপ একটা stone থাকে। দ্বিদল (আজ্ঞাচক্র) সেইরূপ একটি stone. এখানে আছে একটা চক্ষু, যাকে বলে ত্রিনয়ন। এই চক্ষু একবার খুলে গেলে দুনিয়ার সর্বশক্তি আয়ত্তে এসে যায়, সবকিছু ভোগ করা যায়। কাজেই এদিকে কড়া নজর দাও। এখন আমরা (মুক্তজীব) বন্দী অবস্থায় থাকিয়া পাথরের দিকে অর্থাৎ দ্বিদলের দিকে নজর দেব। এই বন্দী প্রকৃত বন্দী নয়। আমরা মুক্তিকে arrest করেছি, অর্থাৎ মুক্ত অবস্থাকে arrest করেছি আমাদের দরজায় সখেরই জন্য। কিন্তু **আমরা মুক্তিরই গান গাইছি, মুক্তিই আমাদের উদ্দেশ্য। মায়া, মমতা, মোহ ইত্যাদি বিক্ষিপ্ততা বড়লোকের পোষাক অর্থাৎ মুক্তিরই পোষাক।**

এই সৃষ্ট জীবকুল কতবড় ত্যাগী। 'দেহ' পর্যন্ত ছেড়ে চলে যায় আত্মা। কাজেই আমি বড় ত্যাগী। সবাই তবে ত্যাগী। কাজেই জন্মই সন্ন্যাস, ভোগ এখন পোষাক। ফাঁক পেলেই ফেলে চলে যাবে, কিছুতেই আটকাতে পারবে না। তাহলে তোমরা ত্যাগীও ঠিক আছ, মুক্তও ঠিক আছ, ভোগীও আছ। তবে কাজ আর কি করার আছে, বলতে পার? গোলাপ বা সমস্ত ফুলই নিজে নিজে ফুটতে পারে না। **গুরুই তোমাদের ভিতরের সব ফুল ফুটিয়ে দিতে আসেন। কাঁচি দিয়ে ফিতে কেটে জহরলাল, (প্রধানমন্ত্রী), প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর প্রভৃতি যেরূপ উদ্বোধন করেন, গুরুও সেইরূপ উদ্বোধন করেন সব।** ওই কাঁচিখানা গুরু কখনও দেবেন না; ওখানেই ওস্তাদি। কাজেই তোমরা মূলমন্ত্র জপ করবে আর কাঁচিওয়ালার কাছে এসে ছাঁটিয়ে নিয়ে যাবে।

দেবর্ষি নারদের কাছে নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, 'হে প্রভু,

হে নারায়ণ তুমিই বড়।' নারায়ণ বলেন, 'আমার উপরেও বড় আছে'। নারদ কিছুতেই মানতে চান না। রেগে গিয়ে বলেন, 'কে সে?' নারায়ণ বলেন, 'মহামায়া।' নারদ এঁর নাম আগে শোনেন নাই। রওনা হলেন তিনি মহামায়ার সন্ধানে। নারদ চলছেন, চলছেন। অবশেষে উপস্থিত হলেন মহামায়ার আবাসে। দেবর্ষিকে দেখে স্মিতহাস্যে মহামায়া বললেন, 'দেবর্ষি এসেছেন? আগে স্নানাহার করুন, বিশ্রাম করুন। তারপর আলাপ করবো।' মহামায়ার আপ্যায়নে দেবর্ষি খুশী। তিনি চললেন নদীর পাড়ে স্নান করতে। মহামায়ার পরিচারিকারা গামছা,কড়ঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নদীর পাড়ে। 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলে নারদ ডুব দিলেন। ডুব দিয়ে দেখেন সম্পূর্ণ নূতন এক দেশ। জল নেই কোথাও। একজন ওকে তুলে নিয়ে তার সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিল। নারদ তাদের সঙ্গে সকালে যান চাষ করতে। সুখেই ঘর সংসার করছেন। ক্রমে ক্রমে ৪/৫টি বাচ্চা হল। এক বছর সেখানে বন্যা হল। নারদের বাড়ীর সামনে ছিল একটি খাল। বন্যায় খালের জল অনেক বেড়ে গেল। স্ত্রী পুত্র, কন্যাকে নিয়ে খাল পার হতে গিয়ে সবাই ভেসে গেল। নারদ ডুবন্ত অবস্থা থেকে উঠে দেখেন, আগের জায়গায় ফিরে এসেছেন। পাড়ে মহামায়ার পরিচারিকারা তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বার বছর কেটে গেছে। নারদ বিরস বদনে চললেন, মহামায়ার কাছে।

হাসিমুখে মহামায়া বললেন, 'দেবর্ষি এসেছেন? এবার বুঝেছেন মহামায়ার খেলা? এক ডুবেই বার বছর।'

— আজ্ঞে হ্যাঁ। নারদ মনে মনে বলেন, এক ডুবেরই ফল এই। আর বুঝতে হবে না।

নারায়ণ শুদ্ধ গুরু শুদ্ধ তোমরা সব এখন মহামায়ার প্যাঁচে পড়েছ। কাজেই এইটুকু হজম কর। জল জমেই হয় বরফ। বরফের দেশে পাখার বাতাসের প্রয়োজন আছেকি? আবার **কস্তুরী একটুই যথেষ্ট। মৃগ ছুটতে থাকে নিজের কস্তুরীর গন্ধে নিজে বিভোর হয়ে। তোমরা ভরপুর হয়েই আছ। একটু কাজে বসো। তাহলেই বুঝতে পারবে।** আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মন বস্তু বলেই সেই বস্তু দিয়ে সকল বস্তুর বস্তুত্বকে আয়ত্ত করা যায়

২রা জানুয়ারী, ১৯৭১
পার্কষ্ট্রীট

বিশ্ববিরাটের বিরাট শক্তি বীজাকারে আমাদের দেহের প্রতি অনুপরমাণুতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। একদিন সবাই আমরা সূর্যে-চন্দ্রে, গ্রহে-নক্ষত্রে একই যোগাযোগে যুক্ত হয়ে ছিলাম। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের সংস্পর্শে ধাতু, মজ্জা ও রক্ত কণিকার ভিতর দিয়ে জমাট বাঁধতে বাঁধতে আজকের এই রূপে এসে দাঁড়িয়েছি। রূপের পরিবর্ত্তনে সত্তা বা চৈতন্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সেই সত্তা, সেই মন, সেই চৈতন্য আজও আছে।

অতি সূক্ষ্ম বস্তু হচ্ছে আমাদের এই মন। আমাদের এই দেহও একদিন মনের আকারে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিল, যন্ত্রও তার নাগাল পেত না। সূর্যের আলোতে, বাতাসে কত অগণিত ধুলাবালি ভেসে বেড়াচ্ছে; ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থে মনও ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন বিষয়বস্তুর বস্তুত্ব না থাকলে তার নামকরণ হতে পারে না। এই পরিদৃশ্যমান জগতে নানা বস্তু, অগণিত বস্তু বিভিন্ন নামকরণে অভিহিত। **মন বস্তু বলেই সেই বস্তু দিয়ে সকল বস্তুর বস্তুত্বকে আয়ত্ত করা যায়। মন, প্রাণ, চৈতন্য, আত্মা— সব একই অবস্থার অবস্থা, শুধু বিভিন্ন নামকরণে অভিহিত।** মনের যে দ্রুতগতি সেটাই হল প্রাণ। জগতের সমস্ত বস্তুর সাথে, সমস্ত জীবের সাথে আমাদের সত্তা বাঁধা ও গাঁথা আছে বলেই মনন করার সাথে সাথে আমরা কত কি দেখছি, কত কি শুনছি। একই মনন-শক্তি একবার চোখে, একবার কানে, একবার জিহ্বায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি মনেরই শক্তি।

ফুল ফল যেমন বীজের প্রকাশ, মনটাও তেমনি অন্তর্নিহিত

শক্তির প্রকাশ। প্রকাশটাই হচ্ছে মন। এখন মনটা যে কি, কেউ তো চোখে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু সবাই বলছে, 'মন বসে না', 'মন চঞ্চল', 'মন চায় না', 'মন এই কাজ করতে ভালবাসে না', ইত্যাদি। মনটা যে কি, তাকে দেখাও যে যায় না। কিন্তু তাই বলে যে, মন বলে কিছু নেই, তাতো নয়। মন আছে। সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে মন। এখন মনটা যে কিভাবে থাকে, কেমন করে থাকে, সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। সাধারণভাবে আমাদের যে সাধনা, ধ্যান-ধারণার যে পথ-পদ্ধতি বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত আছে, সেগুলোকে বুঝতে গেলে বা করতে গেলে, আগে ভালভাবে জানা দরকার। আর মনের বিষয়েই বা এত কথা কেন সবাই বলে গেছেন? 'মনকে স্থির কর', 'মন না বসলে কোন কাজ হয় না', এই বিষয়ে অনেকের অনেক মত, অনেক পথ, অনেক উপদেশ রয়েছে। **এই মন বসাবার জন্য, মন স্থির করার জন্য অনেকেই অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজও মনের যে কি কাজ, মন যে কি করছে, কোন আখ্যায় ব্যাখ্যায়, কোন সীমার বাঁধনে মনকে বাঁধতে পারেননি।**

মন কাকে বলছে? মন বলে যাকে বলছে, সেটা কি? মনের কাজ কি? মন সদাসর্বদা নানা ভাবনায় ব্যস্ত। যেটা আমরা ভাবি বা চিন্তা করি, ভাবনা দিয়ে ভেবে ভেবে যেটা আমরা সমাধান করি বা স্মরণ করি; আবার যে জিনিস চিন্তা করতে গিয়ে বহু চিন্তার মাঝে গিয়ে জড়িয়ে পড়ি, বিভিন্নরকমে বিভিন্নভাবে নানা ভাবনায় আমাদের ভিতরে যে ছড়িয়ে আছে, সেটাই মন। আমরা যেই জিনিস চিন্তা করি, সেই জিনিসের উপর পুরোপুরি সক্ষমতা থাকছে না এবং বাকীটা যেভাবে যেদিকে খুশী ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঐটাই মনের কাজ। সেটাকেই আমরা বলছি, মনের বিক্ষিপ্ততার কাজ বা চঞ্চলতার definition (সংজ্ঞা)। দেহের ভিতরে থেকেও যেটা ছড়িয়ে আছে, সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঐটাকেই আমরা মন বলে অভিহিত করছি। মনের কাজই হচ্ছে এই সমস্তগুলো। যেটা ভাবছে, ভাবনায় আসছে, মন সবসময় ভাবনার মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। তাহলে মনটা যে ভাবনার মধ্যে আছে, সেটা বুঝতে পেরেছ তো? এখন ভাবনার মধ্যে যেটা আছে, তাকে মন বলে না ব'লে, যদি

একটু অন্যভাবে বলি; ভাবনার মধ্যে যিনি আছেন, যিনি ভাবছেন, তিনি ভেবে ভেবে সবকিছু বস্তুকে সংগ্রহ করে তার তত্ত্ব, তার তথ্য এনে সমাধান করে দিচ্ছেন। আবার বোঝাবার জন্য সব কিছুর ভিতরে গিয়ে নাড়াচাড়া দিচ্ছেন এবং ভালভাবে অবগত যাতে হয়, তারজন্য চেষ্টা করছেন অর্থাৎ সবকিছুর ভিতর দিয়ে তিনিই মনকে সেইভাবে চালিত করছেন। এইভাবে যদি বলি, বুঝতে কোন অসুবিধা তো নেই।

মনকে কে চালাচ্ছে? এই যে চারিদিকে ঘুরছে, বেড়াচ্ছে, যাকে আমরা বিক্ষিপ্ত বলি, চঞ্চল বলি, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই যে এদিক ওদিক ঘুরছে, এটা কি মনের ইচ্ছায় ঘুরছে? না, চিন্তার ইচ্ছায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? না, কারও দ্বারা চালিত হচ্ছে, সেটা তোমরা আগে চিন্তা করে দেখ। এই যে মন এদিক ওদিক যাচ্ছে, তুমি যেখানে বসাতে চাও, বসছে না, চারিদিকে সে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই যে মন চারিদিকে চলে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? **বাচ্চারাও এদিক ওদিক চলে যায়। কিছু যায় খেয়ালে, কিছু যায় আন্দাজে। বাচ্চারা যা খুশী ভাবছে, তাই করে যাচ্ছে। মনটা কি তাহলে শিশুর মতো? শিশুর মত সে (মন) যা খুশী ভাবছে, যেদিকে খুশী, যেখানে খুশী যাচ্ছে, আসছে।** শিশুর কাছে ছাদের কার্নিশে বসাও যা, ঘরের ভিতরে চেয়ারে বসাও একই। ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে পড়ে গেলেও সেদিকে তার খেয়াল নাই। সেই সতর্কতা তার (শিশুর) আসছে না। সে ছাদের কার্নিশের পাশে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, যেকোন মুহূর্ত্তে পড়ে যেতে পারে, সেদিকে তার দৃষ্টি নাই। কিন্তু তাকে উঁকি মেরে দেখতে হবে, ধরতে হবে, হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে, এইসব ভাবনায় ভাবনায় আপনমনে সে চলে যাচ্ছে। যেদিকে যাবার যাচ্ছে, যা খুশী ধরছে, সে পড়লো বা মরলো, কোন খেয়াল নাই।

তাহলে শিশু কি তার ইচ্ছায় যায়? ইচ্ছায় গেলে, গেল। কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, খেয়াল নাই। পড়ে গেলে, মরে যাবে, সেই বুদ্ধি তার নাই, ভয় নাই, ভীতি নাই। চলতে শিখেছে, যাচ্ছে। আমাদের মনটা কি সেইভাবেই যাচ্ছে? যেদিকে খুশী যাচ্ছে, যা খুশী করছে, যা খুশী ভাবছে। শিশুর প্রতি সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়,

''এই এদিকে যাস্ না, সেদিকে যাস্ না। এখানে বসে থাক। তাকে ধরে ধরে টেনে টেনে আনতে হয়।'' কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হলেই, সে (শিশু) আবার যেদিকে খুশী যাচ্ছে। কখনও ছাদ থেকে পড়ে যায়। কখনও আছাড় খায়। কখনও জলে পড়ছে, কখনও আগুনে পড়ছে। কখন যে কি করছে; একটা বেসামাল অবস্থা। **আমাদের মনটাও যেন শিশুর মতো ঐরকমই করছে। একেবারে উথাল-পাথাল, উথাল-পাথাল অবস্থা।** মন কি তার ইচ্ছায় যাচ্ছে? না, অনিচ্ছায় যাচ্ছে? শিশু কি তার ইচ্ছায় যাচ্ছে? না, অনিচ্ছায় যাচ্ছে? অথবা তার (শিশুর) স্বাভাবিক গতির মধ্য দিয়ে তারপথ বেছে নিয়েছে? সে এগিয়ে চলছে, তো এগিয়েই চলছে। শিশু তো ছাদ থেকে পড়তে দ্বিধা করে না।

আমাদের মন যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করছো না। সে ঘুরছে শিশুর মতন। শিশু হাটে বাজারে হারিয়ে গেলে 'বাবা কই?' বাবা, বাবা বলে কাঁদছে। 'মা কোথায়? বাবা কোথায়?' বলে কাঁদছে, আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আর আপনমনে যেদিকে মন চায়, হাঁটছে। আমাদের মধ্যে মনটা সেইভাবেই কি চলছে? আপন গতির পথে যেদিকে যায়, যেভাবে যায়, যেভাবে চলছে, সেটা কি তার স্বাভাবিক গতি? সেটা কি তার (মনের) স্বভাব? শিশুরও সেটাই স্বভাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশু জানতে পারবে, 'আমি পড়ে গেলে মরে যাব', এই ভয়ভীতি তার যতক্ষণ পর্যন্ত না আসছে, ততক্ষণ তার গতি সহজ।

আমাদের মনটাও সেই শিশুর মতো। যেভাবে খুশী, যেদিকে খুশী, যেখানে খুশী যায়। শিশুরই মতো আশঙ্কা নেই, ভয় নেই, ভীতি নেই। আমরা কত জায়গায় হুঁচোট খেয়ে আসছি, আঘাত পেয়ে আসছি, দুঃখ পেয়ে আসছি। অনুশোচনায় অনুতাপে জর্জরিত হয়ে আসছি, ব্যথা পেয়ে আসছি। কিন্তু বুঝ নাই। কোথায় গেলে কি হবে না হবে, কি পাবো না পাবো, জানি না। আপনমনে চলছি, চলতে হবে চলছি। কিন্তু ইচ্ছে করে যে চলছি, তা নয়। তবে এটাই হয় যদি মনের নিয়ম এবং স্বভাব; **প্রকৃতির নিয়ম যদি এইরকমই হয়ে থাকে যে, মন এই করবে, ঐভাবেই**

যাবে, চারদিকেই ঘুরবে, যা খুশী তাই ভেবে নেবে, ভাবতে ভাবতেই যা খুশী তাই কুড়িয়ে নেবে, তাহলে কি করার আছে? তুমি যাহা প্রথম ভাবছিলে, তার থেকে সে সরিয়ে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে— নিয়ে যায়। তাতে আসে যায় না কিছু। কারণ ঐটা তার (মনের) স্বভাব। ঐটাই স্বভাব। ঐটাই নিয়ম। সেই নিয়মের ভিতর দিয়ে মন ঐভাবেই চলতে থাকে।

যদি প্রকৃতির নিয়মেই এটা হয়ে থাকে, প্রকৃতির স্বভাবই যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে প্রকৃতি কি চঞ্চল? না, বিক্ষিপ্ত? তাতো কখনো হতে পারে না। প্রকৃতি চঞ্চল নয়, বিক্ষিপ্ত নয়। সে অচল, সে অটল। তাঁর নিষ্ঠা আছে। সবকিছুর ভিতর দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। তবে তিনি (প্রকৃতি) বহুমুখী। **বহুসৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁর রূপের প্রকাশ— বহু সৃষ্টি, বহু রূপ, বহু ধারা,বহু ভাব। বহু মতে, বহুপথে, বহু ধারাতে যদি তাঁর গতি হয়ে থাকে, সেটা কি চঞ্চলতার পরিচয়? না, বিক্ষিপ্ততার পরিচয়? না, নিষ্ঠারই পরিচয়? না, একনিষ্ঠতারই পরিচয়?** এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগণিত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রকৃতি তাঁর গতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন, সেই গতির ভিতর দিয়ে নিজেকে সবসময় কর্মে লিপ্ত রাখছেন, এটা কোন্ পথ? কোন্ মত? প্রকৃতির অজস্র সৃষ্টিধারার নিয়ম অনুযায়ী সেই ধারাতেই ঐভাবেই বহুভাব, বহু রকম মতের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। এই বহুমুখী সৃষ্টি, অগণিত সৃষ্টি, অগণিত রূপ, অগণিত ভাব, অগণিত ধারা, অগণিত সুর, যার গণনা গণিতের সীমানার মধ্যে রাখা যাচ্ছে না, তাকে কি বলবে বল? তাকে কি চঞ্চল বলবে? এত সুর, এত গুণ তাঁর চঞ্চলতা নয়। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের পরিচয়, তাঁর গুণের পরিচয়, তাঁর শক্তির পরিচয়। কত তাঁর আছে। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অফুরন্ত সুর, অফুরন্ত রূপ, গুণ বা ভাব ফুটে বের হচ্ছে। অজস্র পাপড়ি। সেই সহস্র পাপড়িতে সহস্র গুণ, সহস্র সুর, সহস্র ধারার পরিচয়। সহস্র বলতে শুধু হাজার নয়; 'অগণিত' বুঝাতেই 'সহস্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অগণিত তাঁর পাপড়ি, অগণিত তাঁর মুখ, অগণিত তাঁর ফণা। সেই ফণা বিস্তার করে পৃথিবীকে তিনি রক্ষা করছেন,

জগৎকে রক্ষা করছেন। সমানভাবে, সমানসুরে, সমতালে, অগণিত ধারাতে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এটা চঞ্চলতাও নয়, বিক্ষিপ্ততাও নয়। এটা তাঁর বিরাট শক্তিরই কথা।

আজ আমাদের ভিতর সেই মন সেইরকমভাবে অজস্র ধারাতে অজস্র পথে অজস্র চিন্তা নিয়ে বসে আছে। তবে কেন থাকবে না? কেন থাকবে না? মা যেমন, তার বাচ্চাটা সেইরকমই তো হবে। গাভী দাঁড়িয়ে প্রসব করছে। গাভীর বাচ্চাটা জন্ম গ্রহণের পরেই লাফাচ্ছে। আমাদের (মানুষের) বাচ্চা কি ভূমিষ্ঠ হয়েই দাঁড়ায়? না, লাফায়? গাভীর বাচ্চাটা দাঁড়াচ্ছে, পড়ছে, লাফাচ্ছে জন্মের সাথে সাথেই। ঐ বাচ্চার ঐ নিয়ম। দুদিন পরেই দৌড়াচ্ছে। আর আমাদের বাচ্চা দুদিন পরে দৌড়ায়? না, লাফায়? ওর (মানুষের বাচ্চার) নিয়মই সেরকম।

প্রকৃতির সেই বিরাট সৃষ্টির যে ধারা, প্রকৃতির যে নিয়ম, অজস্র ধারায় যে বহুমুখী, তার যে সৃষ্টবস্তু মন— মন কি বস্তু? সে তো জন্মানোর সাথে সাথেই এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। আরে বাপরে বাপরে। ওরে (মনকে) ধরে রাখবে কি করে? প্রতি বস্তুর মধ্যেই সে নিজেকে প্রকাশ করছে, আনছে, টানছে। আর আমরা তাকে উৎপাত মনে করছি। সবসময় বলছি, 'আর পারছি না'। আরে বাবা রে বাবা। এই মন স্থির করে বসলাম। আবার একটু পরেই কোথায় গেলাম। কোথায় নিয়ে গেল। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অসোয়াস্তি ভোগ করছি, অশান্তি ভোগ করছি। মনে করছি, পাপের ফল বুঝি এই। মনটা কিছুতেই বসাতে পারছি না। মনটা যে এইরকম কথাই বলবে।

ছাগের সাথে সিংহশাবকের তুলনা? কুকুর দেখলে কাক পালায়। আর সিংহশাবক হাঁ করে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ও ওদের ধমকাচ্ছে, 'কোথায় যাচ্ছিস?' কুকুর ভয়ে জলের ধারে চলে গেছে, গোঙাচ্ছে। সিংহশাবক মনে করছে, এক দলেরই বুঝি। এক দলের হলে কি হবে? ওতো দৌড়াচ্ছে। মানুষ কাজে যাচ্ছে। কাজ করছে আর মেজাজ খারাপ হচ্ছে, 'মন বসছে না।' এই হাটে যায়, বাজারে যায়। এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে, সেদিক যাচ্ছে; একেবারে উথাল-পাথাল। **অন্তরে যাকে বসাচ্ছো,**

সেতো আর কবিরাজী বড়ি নয় যে, 'এইখানে বসে থাকো', বললেই সে (মন) বসে থাকবে। বসে থাকার জিনিস সে নয়। এতো ছাগ নয়, এ যে সিংহ। ওকে ছাগের বড়ি দিলে কি হবে? ওযে সিংহ। ও কেন বসে থাকবে? লাফিয়ে লাফিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলে। মানুষ যেভাবে কথাগুলি বলছে, বিরক্ত হয়েই বলুক, আর যেভাবেই বলুক, মনের কথাই বলছে। তারা বলছে, 'ভাল লাগছে না। মন বসছে না। মনকে বসাতে পারছি না। মন কিরকম করছে। এদিক ওদিক সেদিক যাচ্ছে, আসছে। একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়লো। কি করে মনকে বসানো যায় বাবা? কত শাস্ত্র-পাঠ করলাম। কত জপ-ধ্যান করলাম। কত যোগ, তপ করলাম। কত প্রাণায়াম করলাম। কিছুতেই মনকে বশে আনতে পারলাম না। মনকে স্থির করতে পারলাম না।'

আর একজন ভিতরে বসে বসে বলছে, এই তো কথার মত কথা। এই তো বিরাটের কথা। এই তো সিংহের কথা। ঠিক আছে, এই তো বড় ব্যাপারে বড় কথা। বিরক্ত হয়েই বলো; আর যেভাবেই বলো, এই কথাতো সবারই কথা। এই ধরনের কথা তো সবারই। মন বসে না, ভাল লাগে না। হ্যান করে না, ত্যান করে না, এতো সবারই এক কথা। আরে, সবার তো একটা কথাই থাকবে। সবার তো সত্যিকারেরই কথা। সিংহের এই কথা। এতো ছাগলের কথা নয়। **মনটা বসে না। কি করে বসবে? মনকে বসাতে পারছি না। চেষ্টাতো করছি। এটাই হ'ল কথা। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে জিজ্ঞাসা করে যাও, সবাই বলবে একই কথা।** এটাই প্রকৃতির কথা, প্রকৃতিরই কথা এটা। এটাই তার প্রকৃতি। এটাই তার নিয়ম।

তাহলে কি করতে হবে? এই যে ফাৎ ফাৎ, ফাৎ ফাৎ করে এদিক ওদিক ঘুরছে, এটার কি ব্যবস্থা আছে? এটার কি কোন ব্যবস্থা আছে? না, এটা সব দিন কাটিয়ে শেষবেলা পর্যন্ত এই-ই করবে? এটার ব্যবস্থা করার পথঘাট আছে কিছু? এরকম কেন করে? কেন করে? এর আগেও তো বলেছি, শিশু যদি শুয়ে শুয়ে হাত-পা না ছুঁড়তো, সব শিশু Paralysed হয়ে যেত। এতদিন যদি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতো,

হাত নাড়তে পারতো না, পা নাড়তে পারতো না। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে যেত। এটা রক্ষা যে, শিশু শুয়ে শুয়ে সবসময় বক্সিং করে আর সাইকেল চালায়। তার হাত-পায়ের বিরাম নাই। এরকম, ওরকম, সেরকম সে করেই চলেছে। সবসময় অস্থির, আর মুখদিয়ে উ আ কতরকম শব্দ করেই চলেছে। কিছুদিন পরেই উঠ-বোস শুরু করেছে; সাংঘাতিক অবস্থা। এই উঠ-বোস বক্সিং আর নানারকম খেলা সে আপনমনেই করতে থাকে। নিজে নিজে এটা করতে থাকে বলেই শিশু আপনাআপনি বাড়ছে, আপনাআপনি তার মাস্‌ল্‌ শক্ত হচ্ছে। সে টিকে যাচ্ছে। প্রকৃতিতে কেউ কি কাউকে ধরে ধরে শিখাচ্ছে? ডাক্তার যদি বলতো, এটা শিখান। ধরে ধরে শিশুকে শিখানো কি সম্ভবপর কথা? কারও যদি চার/পাঁচটা বাচ্চা হয়, সব বাচ্চাগুলোকে এসব কে শিখাবে? একদিনের শিশু থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত যদি চুপচাপ শুয়ে থাকে, তাহলে সব অঙ্গ বিকল হয়ে যাবে। তাই সে নিজে নিজে হাত-পা ছুঁড়ে ব্যায়াম করতে থাকে। আরে, কোলে নিলেও তো লাফালাফি। এরকম করছে বলেই বাড়ছে।

আজকে তোমরা যে ব্যায়াম করো, বুকডন দাও, বৈঠখারি দাও, ডাম্বল্‌ বার্‌বল ভাঁজ, ঐ খেলাই তো, ঐ ব্যায়ামই তো চলছে। শিশুর খেলাই তো এখনও চলছে। ঐ হাত-পা-ইতো ছুঁড়ছো এখনও। যত ফুটবল খেল, ভলিবল খেল, বৈঠখারি দাও, বারবল লও, ডাম্বল লও, ঐটাই তো চলছে। ঐ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির ভিতর দিয়েই আমরা আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছি। তখন (শিশু বয়সে) ছিল ছোট বল, বেলুন। এখন না হয় দুই মণ, আড়াই মণ, তিন মণ, পাঁচ মণ, আট মণ ওজন নিতে পারছে। সেদিনের সেই ছোট্ট শিশুই আজ এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যায়, সেদিনের সেই শিশুই আজ ১০ মণ ওজন নেয়, গাড়ী থামায়। সেদিনের সেই শিশুই আজ এটা পারছে।

সেদিনের সেই ছোট্ট বাচ্চাটা কি শয়তান, কি চঞ্চল। আরে, এইটাই তো আসল। বাচ্চাটারে কোলে নেওয়া যায় না। লাফাতে লাফাতে কি করতে থাকে। আরে, ঐটাই তো আসল। ঐ আসলের

থেকেই তো চললো সব।

আমাদের মনটাও তো সেইভাবে হুঁচোট পাচোট করতে থাকে। একদণ্ড স্থির থাকে না। ঐটাই আসল। ঐটাই আসল যদি হয়ে থাকে, আমরা কি পাচ্ছি? Nature থেকে আমরা অজস্র অগণিত সুর খুঁজে পাচ্ছি। ওর (মনের) কাজই হচ্ছে সমস্ত জগতের যাবতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে সংগতি স্থাপন করা। কে লাটসাহেব, কে জজসাহেব, সে মানে না। মনে মনে কাউকে বললো, 'আইচ্ছা, দেখাইয়া দিমু নে (আচ্ছা, দেখিয়ে দেব)।' জোরে বলতে পারবে? মনে মনে যেটা বলছো, মনে যেটা আসে, বাইরে বলা যায় না। মনের সাহসটা দেখেছো? মনে যেটা বলো, মুখে সেটা বলতে পারো? কাউকে হয়তো বললে, 'দিমুনে, তোরে ঠাটাইয়া একখান চটকণা দিমু নে (তোকে, ঠাটিয়ে একখানা চড় দেবো)'। ঠাটাইয়া (কষে) তো দিলা। মনে মনে দিলা। মন তো ঠাটাইয়া দিল। তুমি তো পারবে না। কারণ তুমি নিজে দুর্বল। মন তো দুর্বল নয়। কিসের রাজা, কিসের লাটসাহেব। যারে যা খুশী বলে দিল মনে মনে। বাইরে বললেই মুস্কিল। **কেউ যদি বলে, 'আমি সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ।' সব বড় বড় কথা। মন সকলের থেকে বড়। কারও সে দাস হয় না। কারও কাছে ছোট হয় না। সমুদ্র থেকেও সে বড়। এই পৃথিবীর থেকে সে (মন) নিজেকে বড় মনে করে।** মনে মনে মন যা খুশী তাই করতে পারে। কাউকে সে পরোয়া করে না। বেশীরভাগ মানুষই মনে মনে যাকে যখন যা খুশী তাই বলছে। শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যদি একটা যন্ত্র থাকতো, যার সাহায্যে অন্যের মনের কথা সব বুঝতে পারতে, তাহলে আর উপায় আছে? কারও সাথে কেউ মিশতে পারতে? আরে সর্বনাশ, মাথা খারাপ। মনের কথা বুঝতে পারলে, আর কথা নাই। কেউ ঘর করতে পারতে না।

মনে মনে চিন্তার জগতে কারও মায়ের ঠিক নাই, মেয়ের ঠিক নাই, বৌ-র ঠিক নাই। কার সাথে কে কার কথা চিন্তা করছে, শুনলে আঁতকে উঠবে। যন্ত্রটা যদি থাকতো, কারও সাথে মিশতে পারতে না। ভালবাসতে পারতে না; সম্বন্ধ করতে পারতে না। নেমন্তন্ন খেতে

গিয়েছ। যদি বুঝতে পারতে, মনে মনে বলছে, 'ঐ উৎপাতগুলি আসছে রে,' তাহলে আর খাবে সেখানে? 'আরে সর্বনাশ, ওঠ ওঠ ওঠ। এখানে খাব না। উৎপাত বলছে আমাদের।' চিন্তা করেই সরে পড়তে। তাহলে, **মনের কথাটা বুঝতে পার না বলে রক্ষা। ইস্, তাহলে আর কেউ সংসারে সমাজে চলতে পারতে না। একেবারে ঝালাপালা হয়ে যেতে। পাগল হয়ে যেতে।** এখানে দেখ না, বাপে একরকম করে, মায়ে একরকম করে। বৌ-র একরকম কথা, ছেলেপিলের একরকম কথা, অফিসে একরকম কথা, বাড়ীতে আরেকরকম কথা। সর্বত্র যেখানে এত ঝামেলা, তখন হয়তো মনে হবে, এটা বলা উচিত হয় নাই, এইটা করা উচিত হয় নাই। ভালও তো লাগবে না। তুমি হয়তো ভাবছো, 'একেকজন একেকরকম চিন্তা করছে। আমি একরকম চিন্তা করছি। বৌ একরকম চিন্তা করছে। ধ্যাৎ ভাল লাগে না।' **যে যাই কর না কেন, সঠিকতার সুরে না চললে বিচার, বিবেক কিন্তু ক্ষমা করবে না। প্রকৃতির যে স্বভাব, অগণিত সেই স্বভাবে বিচার কিন্তু ক্ষমা করছে না। চেতন কিন্তু ক্ষমা করছে না।** অসোয়াস্তি ঠিকই পেয়ে যাচ্ছ। হাজার রকমের চিন্তা তোমার আসবে এবং যে চিন্তাগুলি কর, ছবিতে যদি বেরিয়ে যেত, তাহলে কেউ কারও সঙ্গে ঘর করতে পারতে না। সংসার করার পক্ষে অসুবিধা হয়ে যেত। অন্তর্যামিত্বের দরজাটা আটক আছে বলে রক্ষা। তবে মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যায়। মাঝে মাঝে রাগ-টাগ করলে একেকখান বেরিয়ে যায়। তাতেই একেবারে যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে। মনের থেকে হোক না হোক,কথায় যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে।

মন বলছে, আমি উলঙ্গ, আমার সৎসাহস আছে। আমি চিন্তা করে যাব, যা খুশী তাই হোক। তার সাংঘাতিক সাহস। 'ও' কাউকে ভয় পায় না, কাউকে মানে না। তবে কেন সে এরকম করে? কিসের জন্য সে এরকম করছে? কেন সে করবে না? একটা হাতীকে তুমি খেতে দেবে না। তাকে তুমি জল দেবে না, খাদ্য দেবে না। যেটুকু দিয়েছ, সামান্য কিছু খাদ্য দিয়েছ— দুইটা কাঁঠাল পাতা, চারটা আম পাতা; একটা হাতীর খোরাক কি এই? দুইটা কলার চোকলা (খোসা) আর কয়েকটা পাতা দিয়ে যদি তার খাদ্যের ব্যবস্থা করো, সেই হাতীর কি তাই খোরাক?

৮/১০ মণ, ২০ মণ খাবে যে, তাকে যদি দাও ২/৪ ছটাক বা আধসের খাদ্য, তবে সেই হাতী ক্ষুধায় চিৎকার করবে না? সেই হাতীকে খাঁচায় আটকে রেখেছ; জল দিয়েছ ছোট পাত্রে; তবে সে তৃষ্ণায় ছটফট করবে না? সে খাঁচা ভাঙবার চেষ্টা করবে না? তা করলে, সেটা কি অন্যায় করছে, বলবে? বল? সে চিৎকার করছে, জল জল করছে, খাঁচা ভাঙবার চেষ্টা করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, লাফালাফি করছে, নিজের মাথা নিজে কুটছে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিৎকার করছে। তুমি মনে করছো, সে অন্যায় করছে। অন্যায় সে মোটেই করছে না। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি মিটে যেত, তবে সে শান্ত হয়ে বসতো।

তারপরেও একটা কান্না আছে। মুক্ত হবার জন্য কান্না। তার সাথীরা কোথায়? তার স্ত্রী-পুত্র কোথায়? মা-বাপ কোথায়? সন্তান থাকলে সন্তান কোথায়? সে বন্দী অবস্থায় আছে। মুক্তপথে বিচরণের থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে। তার জন্য দুঃখ করছে। তার একটা আর্ত্তনাদ আছে। সেই আর্ত্তনাদ হচ্ছে আলাদা। সেই চোখের জল আলাদা। কিন্তু ক্ষুধার আর্ত্তনাদ আলাদা। দুইটার অনেক ব্যবধান, অনেক বেশীকম। মুক্তির জন্য তার চোখের জল টপটপ করে পড়ছে। সে ভাবছে, কোথায় মুক্তভাবে বনে বনে বিচরণ করতাম। কোথায় আমার ছেলেপিলে, কোথায় আমার সাথী বন্ধুরা? তারা কিভাবে কোথায় বিরাজ করছে? আমি আজ কিভাবে বন্ধ খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে আছি। সে যেন নিজের চুল নিজে টানছে। সেটা একরকম অবস্থা।

আজ আমাদেরও ঠিক এক অবস্থা। আমরাও বন্ধ ঘরে ঠিকই আছি। কিন্তু কি অবস্থায় আছি? **সংস্কারের বন্ধ ঘরে (খাঁচায়) কি অবস্থায় রয়েছি আমরা? সেই 'হায় হাসান', 'হায় হোসেন'। জলের অভাবে, খাদ্যের অভাবে তারা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কারবালার প্রান্তরে তারা জলও পায়নি, খাবারও পায়নি। চিৎকার করে মরেছে সব।** আজ আমরা কি করছি? সেই দুঃখ স্মরণ করে বুক চাপড়ে চাপড়ে 'হায় হাসান', 'হায় হোসেন' করে দুঃখ নিবেদন করছি। জানাচ্ছি,বুক চাপড়ে চাপড়ে কিভাবে তেষ্টায় তারা সব মরে গেছে। **আজ আমরা 'হায়**

হাসান', 'হায় হোসেন' করে চিৎকার করছি কেন? কারণ আমরা মনের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারছি না। তুমি মনের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করবে না। ওর (মনের) প্রতিদিনের খোরাক হচ্ছে, এক পুকুর ভর্ত্তি খাদ্য। তুমি ওকে (মনকে) দিয়েছ একটা বাটিতে করে, 'তুই এটাতে খা।' কি করে চলবে? সে চিৎকার করবে না? সুতরাং সে (মন) চিৎকার করবেই। সে আর্ত্তনাদ করবেই। সে চঞ্চল? না, বিক্ষিপ্ত? কি বলবে তাকে? ব্যথায় ক্ষুধায় তেষ্টায় সে আর্ত্তনাদ করছে।

প্রকৃতির নিয়মে, সৃষ্টির নিয়মে, এই যে খালি জায়গাটা, যদি বাতাসে ভরা না থাকতো, এতগুলো জীব বাঁচতো? এই বিশ্বের খালি জায়গায় যদি বাতাস না থাকতো, যত জলই হোক, যত তাপই হোক, বাতাস যদি ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়ে যেত, সেই দেশের লোক বা জীব বাঁচতে পারতো না। সত্যিকারের খালি জায়গাটা এত বাতাসে পরিপূর্ণ আছে বলেই তো সবাই বেঁচে আছে। এক মিনিট যদি বাতাস আসতে দেরী করতো, খালি থাকতো জায়গাটা, মুহূর্ত্তে সব অজ্ঞান হয়ে যেত। আমাদের এমন অবস্থা, মনকে না দেওয়া হয় ক্ষুধার বস্তু, না দেওয়া হয় তৃষ্ণার বস্তু, না দেওয়া হয় তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার বস্তু। তার (মনের) যে খোরাক, সেই ব্যবস্থা আমরা ঠিকমতো করতে পারিনি বলেই, আজ আমাদের এই অবস্থা। তার ফলেই এত দুঃখ পাচ্ছি, অশান্তি পাচ্ছি, এত ঝড় পোহাচ্ছি। তাতে কি হচ্ছে? সমাজে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষ, কলহ সর্বদাই চলছে। ওইটা মিটাতে গিয়ে একজন আরেকজনকে হিংসা করছে, সন্দেহ করছে, দ্বন্দ্ব করছে, রাগারাগি করছে; ভুলবুঝাবুঝি চলছে। একজন আরেকজনকে ভুল বুঝছে। এই **ভুলবুঝাবুঝি রোগটা কতবড় রোগ জানো? এই রোগ একবার ঢুকলে সহজে আর যেতে চায় না।** এটাই সাংঘাতিক চলছে। 'আমাকে এই কথা বললো?' এই বলে যে বেঁকে বসলো, আর উপায় নাই। আচ্ছা, তাকে সঠিকভাবে বুঝাতে গিয়ে কত অশান্তি, কত ঝঞ্ঝাট যে পোহাতে হয়, কত যে মালমশলা খরচা করতে হয়, তা আর বলার নয়।

এখন ভুল যে বুঝেছে, কেন ভুল বুঝলো? ভুল না বুঝে তার

উপায় নাই। কারণ এমন অবস্থা মনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বা সৃষ্টি করিয়েছে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে ভুল বুঝে বুঝেই সে দুঃখটা পাচ্ছে, ব্যথায় জর্জরিত হচ্ছে। কিরকম? চরম তেষ্টা যখন পায়, মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়। চরম তেষ্টায় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেয়। এই বার্মা থেকে যারা এসেছে, তারা আমায় জানিয়েছে। তারা কি অবস্থায় এসেছে, শুনলে মাথায় হাত দিয়ে বসবে। এক গ্লাস জলের দাম ৫০ টাকা নিয়েছে। এক গ্লাসজল। নিজের সন্তানকে বলি দিয়ে এসেছে এক গ্লাস জলের জন্য। তেষ্টায় আর উপায় নাই। তাহলে একটা তেষ্টাতেই সমস্ত বৈরাগ্য এসে পড়ে। সংসার, সমাজ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব নষ্ট করে দেয়। একটা গ্লাস জলের অভাব হলে সমস্ত কিছু ছারখার হয়ে যায়। চিন্তা করে দেখতো, এক গ্লাস জল— কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং নিজেই তখন উথাল-পাথাল করবে।

মন একটা বস্তু, আগেই বলেছি। এই অবস্থায় মনকে যদি তেষ্টায় রাখ, তার তৃষ্ণা নিবারণ না কর, তবে তো ভজঘট বাঁধবেই। ওর (মনের) বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, চলবার ক্ষমতা আছে। যেটা ভাবছে, সেটাই করতে চায়। **খাদ্য সংগ্রহের জন্য মন বুদ্ধির কাছে হাত পাতে। বুদ্ধিকে বলে, 'আমায় খেতে দাও।' অন্য কোথাও থেকে যে খোরাক সংগ্রহ করবে, সেই ক্ষমতা ওর নাই।** খাদ্যটা নেবে তোমার থেকে, বুদ্ধির থেকে।

আর আমরা বুদ্ধিওয়ালারা কি করছি? আমরা বলছি, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমরা মারবো।' হাতীর মত বিরাট মনকে নিয়ে আমরা কি করছি? আমরা সামান্য কাজ করছি। আমরা ঘুরছি, বেড়াচ্ছি, এদিক ওদিক করছি। সেই মন নিয়ে তোমরা নানা জায়গায় যাচ্ছ, নানা জিনিস দেখছো। অফিস করছো, বাড়ীতে আসছো, ঝগড়া করছো, হিংসা করছো, চুরি করছো, ডাকাতি করছো; আরও কত কি করছো। **আজকের সমাজে এই যে যুদ্ধ, অভাব-অভিযোগ, যা কিছু বিবাদ-কলহ, সবই মনের উপযুক্ত খোরাকের ব্যবস্থা করতে পারিনি বলেই মন এদিক ওদিক করছে।** তার উপযুক্ত খাদ্য না পেয়ে মন কি করছে? সামনে যা পাচ্ছে,

সেইগুলি খেয়ে তাতেই সাড়া দিচ্ছে। আমরা খাদ্য হিসাবে কি দিচ্ছি? আমরা বলছি, 'মারামারি কর। খুনোখুনি কর।' তখন মন করে কি? এইগুলি থেকেই খোরাক খোঁজে। মন তার ইচ্ছেমতো যা খুশী করছে। মারছে, ধরছে, গোলাগুলি ছুঁড়ছে, লুটপাট করছে। সমস্ত উথাল-পাথাল করে সবকিছু ওলোটপালোট করে দিচ্ছে। আর তার থেকে সাময়িক একটা খোরাক নিয়ে নিচ্ছে। প্রকৃত খোরাক পাচ্ছে না। কিন্তু খোরাক একটা নিয়ে নিচ্ছে। সে এক একটা অবস্থার সৃষ্টি করছে। আর চারিদিকে আরও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ গড়ে উঠছে। যার যা খাদ্য নয়, তা তাকে দিলে যা হয়, তাই হচ্ছে। সম্মুখে কলকৌশলের আশ্রয় নিয়ে, সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে এগুলো করাচ্ছে। আর মন সেদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

মনের কাজই 'ও' (মন) বসে থাকবে না। শিশুকে দেখবে, ১ সেকেণ্ড বসে থাকে না। হাত-পা নিয়ে সে সবসময় ব্যস্ত। কেন? মনের দোলনায় দুলছে বলেই, তার ক্ষণিকের বিরাম নাই। সে (শিশু) এদিক করছে, ওদিক করছে, বসছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে। এটা ধরছে, ওটা ধরছে— ভীষণ ব্যস্ত সবসময়। মনের দোলনায় দুলছে বলেই সে এরকম করছে। আরেকটা নিয়মের মধ্যে যখন সে যায়, তখন আবার একটু একটু করে পরিবর্ত্তনের দিকে যেতে থাকে।

আজকে আমাদের যে অবস্থা, তাতে কি হয়েছে? আমরা শতকাজে ওকে (মনকে) ব্যস্ততায় রেখেছি। ওকে যে কাজে লাগাবে, সেই কাজই সে করে আসবে। তোমাকে সে মিটিয়ে দেবে। তুমি সেটা কার্যে পরিণত করো বা না করো, সে দেখবে না। সবই সে করবে। স্নান করবে, খাবে, অফিস যাবে। তাড়াতাড়ি করে স্নান করলো। খেতে বসলো, 'দাও, দাও, দাও।' খাওয়া শেষ করলো। জামা-কাপড় পড়লো। বাস ধরলো, অফিসে পৌঁছালো। সব সে করছে। মন কিন্তু চালাচ্ছে তোমাকে। বারবার তুমি মনের কাছেই যাচ্ছ। সব সে তাড়াতাড়ি করছে। অফিসে গেল, কাজ শুরু করে দিল। বসিয়ে রাখেনি তোমাকে। **মন কিন্তু সব সময় তোমাকে ব্যস্ত রাখছে। ওর খোরাক কোথায়? এই সাংসারিক কাজকর্ম থেকেই তার খোরাক সাময়িকভাবে জোগাড় করে নিচ্ছে।**

এমনি এমনি সে খোরাক নিচ্ছে। তার পেট তো ভরছে না। পেট ভরেনি বলেই একটা ছেড়ে আবার আরেকটার মধ্যে যাচ্ছে। যেটার মধ্যে যায়, ধুপ্ করেই যায়। যেটার মধ্যে পড়ে, ধপাস্ করে গিয়ে পড়ে। অশান্তি, এমন অশান্তি দিল তোমাকে যে, তুমি দিশেহারা হয়ে বলছো, 'ইস্, এত অশান্তি।' বিরাট তো, তার সবই বিরাট। তাকে ঘরে জায়গা দিতে পারবে না। দৌড় দিচ্ছে। কতদূর যাবে, সীমানা ঠিক নাই, ধরাস্ করে উঠেছে। বেলুনের মত ফেটে গেছে। যেদিক দিয়ে যাক্, সেদিক দিয়েই 'ও' (মন) সাংঘাতিক। এটাকে যতই তুমি কন্ট্রোলে রাখতে যাও, কন্ট্রোল করতে পারবে না।

মনকে যতই তুমি আটকিয়ে রাখ না কেন, তার power (শক্তিটা) এতবড়, এত বিরাট যে, যেদিক দিয়ে যায়, একেবারে জানিয়ে দিয়ে যায়। ভালবাসা এমনই ভালবাসা যে, শেষবেলা একেবারে মাথায় বাড়ি। কোনটার মধ্যেই তার তৃপ্তি নাই; থাকতে পারে না, থাকবে না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপযুক্ত খোরাক না দিয়েছ, সে (মন) শান্ত হতে পারবে না। এই সমাজের মধ্যে এতবড় বিরাট-মনকে দিয়ে খুনোখুনি খেলতে শুরু করেছ। তাকে সামাল দেবে কি করে? তুমি তাকে সামাল দেবে কি করে? এতো ভূতকে কাজ দেওয়ার মতন।

একজন ভূত সিদ্ধ, পিশাচ সিদ্ধ হয়েছে। ভূত এসে উপস্থিত তার কাছে। সে ভূতকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কি চাস্ তুই?'

—আজ্ঞে, আমি কাজ চাই। তবে একটা কথা, কাজ না দিতে পারলে, 'তোকে শেষ করবো।'

এমনই অবস্থা, ভূতকে কাজ দিয়ে আর কুলাতে পারছে না। যা কাজ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেয়। কাজ না দিতে পারলেই ঘাড় মট্কাবে। এতো মহামুস্কিল। কত আর কাজ দেবে? মনটা হচ্ছে ঠিক সেরকম। মন এমনই এক আশীর্বাদ; আশীর্বাদই বলবো তাকে, এখন অভিশাপের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার (মনের) কথা হল, 'কাজ দাও তো দাও। না দিলে দেখিয়ে দেব।' এমন দেখান দেখাচ্ছে যে, একেবারে

উথাল-পাথাল করে ছেড়ে দিচ্ছে।

এর সমাধান হবে কি করে? সমাধান হবে না। গণিতে মিলবে না। তুমি বললে, 'আমি যোগ অঙ্ক পারি।' কিন্তু হাতের ১টা তো যোগ দিচ্ছ না। ১টা যোগ দিতে ভুলে গেছ। ভুলে গেলে কি ক্ষমা পাবে না কি? ক্ষমা পাবে না। হাতের ১ বাদ দেওয়াতে একবছর পরেও অঙ্কের ফল যদি মিলাতে যাও, ফলটা ভুলই হবে। ঐ হাতের ১ বাদ দেওয়ার জন্য অনেক অঙ্কই ভুল হবে। দান কর, ব্রত কর, কর্ম কর, গঙ্গায় স্নান কর, তীর্থভ্রমণ কর; সব করে শেষ করলে। কিন্তু হাতের ১টা যোগ দিতে ভুল হয়ে গেছে। তাই সব ফলই শূন্য। হাতের ১টা তো যোগ দাও নাই।

দুই বন্ধু একসঙ্গে বেড়িয়েছে। কিছুদূর একত্রে গিয়ে একজন গেল কুচুনীপাড়া, আরেকজন গেল মন্দিরে। 'ও' কয় সে কত আনন্দে আছে। সে কয়, 'ও' কত আনন্দে আছে। মৃত্যুর পরে যে পট্টিতে (কুচুনী পাড়ায়) গেছে, সে স্বর্গে গেল। কারণ সে তো ঐখানে বসে মন্দিরের চিন্তা করছে। আর ঐটা মন্দিরে বসে ঐখানের চিন্তা করছে। তাই মৃত্যুর পরে তার স্থান হল নরকে।

কুচুনীপাড়ায় বসে বসে সেই বন্ধু চিন্তা করছে, আমার বন্ধু ভগবানের স্মরণে আনন্দে আত্মহারা হয়ে রয়েছে। কত কীর্তন করছে। আর আমি এখানে কি নরকের মধ্যে পড়ে আছি। আ-হা-হা, বন্ধু আমার কত সুন্দর চিন্তা করছে।

আর এই বন্ধু মন্দিরে আরতি দেখছে, আর চিন্তা করছে, আমার বন্ধু ঐখানে মদের বোতল নিয়ে কত নাচানাচি, কত স্ফূর্তি করছে। সে ঐ কুচুনীপাড়ার চিন্তাতেই বিভোর হয়ে রয়েছে। বসে রয়েছে কিন্তু মন্দিরে দেবতার বিগ্রহের সামনে। হয়ে গেল। দু'জনে দু'রকম ফল পেল। ঐ মনটা দিয়ে যদি ঠিকমতন কাম (কাজ) করতে না পার, তার খোরাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না দিবা (দেবে), এই পৃথিবীর কোন বিষয়বস্তুতে কিছুই লাভ হবে না। যতই গঙ্গায় স্নান কর, আর দান-ধ্যান কর, যা দিবা (দেবে) সব শূন্য। প্রেসিডেন্ট ট্রেন রিজার্ভ করে গেল। তারজন্য আলাদা

পুলিশ-গার্ড সব দাঁড়িয়ে গেল। মনে কোর না প্রেসিডেন্টের বৌ গঙ্গায় স্নান করছে ব'লে একেবারে স্বর্গবাসে গেল। কিছুই না। দাম কিছুই নাই।

প্রকৃত কথা হ'ল, এই যে এতবড় মনটা চারিদিকে ঘুরছে, ওর খোরাকটা আমাদের দিতে হবে। আমার ঘরে এতবড় সম্পত্তিটা যখন দিয়ে দিয়েছে, তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তো করতে হবে। মনটা কিন্তু জীব, প্রকৃতি থেকে তোমাদের দিয়ে দিয়েছে একটা করে সাথে সাথে। জন্মের সাথে সাথে এই যে ঘুরছে, দৌড়াচ্ছে; এটা কিন্তু একটা বড় জীব। এইটা যে দিল প্রকৃতি থেকে, কেন দিল? তোমাদের মেরে ফেলার জন্য এটা দিয়েছে? একটা আক্কেল দিয়ে দেই তোমাদের এটা দিয়ে? প্রকৃতি কি তাই বলছে? এমনি এমনি তোমাদের এই সম্পত্তি দেয় নাই।

এক ব্যক্তি গেছে রাজার কাছে কিছু পাবার আশায়। সে দিন আনে, দিন খায়, অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা। রাজা তারে একটা হাতী দান করে দিয়েছেন। হাতীটা নিয়ে রাজার কাছে আবার যেতে হবে। সে বোঝে নাই। রাজকর্মচারী চলছে সাথে সাথে। সে ভাবছে, 'কি নিয়ে চলছি রে বাবা। হাতী, এটা নিয়ে আমি রাখবো কোথায়?' রাজ কর্মচারী বলছে, 'চল, চল।'

সেতো ভেবেই চলেছে, 'এইটা নিয়ে আমি যাবো কোথায় রে বাবা? রাখবো কোথায়?' রাজার কর্মচারীকে বলছে, 'তুমি এইটা নাও'। আমারে ৪ আনা পয়সা দাও। ৪ আনা পেলেই আমি এটা তোমারে দিয়া দেব।'

রাজকর্মচারী বলছে, 'দূর বেটা, চলো।' তাকে নিয়ে চলছে। তখনও সে বোঝে নাই। আবার ভাবছে, 'রাজা যদি বলেন, এইটা না নিলে তোরে গর্দান দেব। না বাবা, যা দিয়েছে, এইটাই সব।' এরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছে। রাজকর্মচারী তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেছে। সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজামশাই তার হাতে একটা কাগজ দিলেন। কাগজে লেখা আছে, ''তোমাকে ৫০০ বিঘা জমি দেওয়া হ'ল, এই হাতীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সেখানে এই বাগান, এই পুকুর, এই

জায়গা-জমি সবই হাতীর খোরাকের জন্য।''

লোকটি তো মহাখুশী। এইবার সে বুঝেছে। মনে মনে বলছে, 'এখন আমি হাতী চালাতে (রাখতে) পারবো।'

রাজকর্মচারী বলছে, 'দাও, আমারে দাও।'

— না, না। ঠিক হ্যয়, ঠিক হ্যয়। রাজা আমারে দিয়েছেন। তোমারে দেব কেন? জায়গা, জমি যা পেয়েছে, একটা হাতীর খোরাক দিয়ে আরেকটা হাতীও পুষতে পারে।

প্রকৃতি আমাদের ভিতরে যেটা (মন) দিয়ে দিয়েছেন, সেটা একটা বড় হাতী। এই যে চলছে, এর খোরাক? প্রকৃতি উইল করে দিয়েছেন। **উইল? উইলটা কি? উইল হল, will force (ইচ্ছাশক্তি)। Will হচ্ছে ইচ্ছা। উইল হচ্ছে দলিল। উইল হচ্ছে সেই দলিল, will হচ্ছে সেই ইচ্ছা। Will-force হচ্ছে সেই বিরাট ইচ্ছা-শক্তি, যা দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা ধারণ করতে পার। উইলই হচ্ছে সেই বিরাট শক্তি ধারণের ক্ষমতাটা; সেই ক্ষমতার অধিকার গ্রহণ করেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছ।**

সেইটা কি? সেই জমিটা কি? সেই বস্তুটা কি? তোমাদের কি cheque দিয়ে দিয়েছে? প্রকৃতি থেকে তোমাদের যে হাতীটা (মনটা) দিল, সেটা দিয়ে তোমাদের কি cheque দিয়েছে, যেই cheque দিয়ে তুমি ঐ হাতীটাকে পোষণ করে রাখতে পার? প্রকৃতি **এমন কি বিশ্বব্যাঙ্কের cheque দিয়েছে? চেক (cheque) একটা দিয়েছে, সেটা হ'ল চেতন, সচেতন। এই cheque-এ সই করেছেন স্রষ্টা নিজে স্বয়ং। বুঝতে পেরেছ? চেতন দিয়েছেন, আর সচেতন। এইটা হ'ল তোমাদের capital (মূলধন), Bank Balance. Bank Balance-টা কোথায়? চেতন আর সচেতনে।** ১ কোটি টাকা যেমন থাকে; চেতন আর সচেতন তেমনই; তাতে আছে ইচ্ছাশক্তি, যা খুশী তা কর। 'তুমি যা খুশী তাই করতে পার, এই শর্তেই চেতন আর সচেতনকে তোমার হাতে সঁপে দেওয়া হল,' এই কথাটি লিখে দিলেন নিজহস্তে স্রষ্টা স্বয়ং।

তাহলে এই cheque-টা নিয়ে তুমি কি করবে? সচেতন কি করবে? প্রতিমুহূর্তে প্রতিকাজে তোমায় জানিয়ে দেবে, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়; কোন্‌টা ত্রুটি, কোন্‌টা বিচ্যুতি, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক। চেতন সচেতনের ঐ capital (মূলধন) থেকে কি Interest তুমি পাবে? কি সুদ তুমি পাবে? এই সুদ তুমি পাবে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যতগুলি বস্তু আছে, যা কিছু আছে, এই সুদ দিয়ে সবার প্রতিশোধ তুমি নিতে পার। এই প্রতিশোধ দ্বন্দ্বমূলক নয়। প্রত্যেকের দানের প্রতিদান হিসাবে, প্রত্যেকের ঋণ পরিশোধ হিসাবে তুমি তা শোধ করে দিতে পারবে।

সেই cheque তোমাদের দান করেছেন নিজহস্তে স্রষ্টা স্বয়ং। সেই cheque দিয়ে তোমরা আরও কি করতে পারবে? সেই চেতন এবং সচেতন দিয়ে এইটুকুনু বুঝতে পারবে যে, কিভাবে কোন্ কাজ করলে সেই হাতীর (মনের) রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। দেখ, কি সুন্দর কথা। তোমার হাতে যদি ১০ লক্ষ টাকা থাকে, তুমি তো বলতে পারবে, আমার টাকাগুলো দিয়ে এই কাজ, এই কাজ করা যায়। তারজন্য কি বুদ্ধি পরামর্শের প্রয়োজন হয়? তোমার হাতে যখন চেতন সচেতনের চেকটি (cheque) আছে, তুমি বলতে পারবে, 'কিভাবে কোন্ পথ অবলম্বন করলে আমি এই কাজ করতে পারি।'

আবার সেই টাকা দিয়ে যদি নেশা করো, কোন অন্যায়কার্যে লিপ্ত হয়ে সেই টাকা নষ্ট করো, সেটাও তো চেতন তোমাকে সচেতন করে দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে বলে যাচ্ছে, 'টাকাগুলো নষ্ট করে দিচ্ছিস্। টাকাগুলো নষ্ট করে দিচ্ছিস্। তুই কিন্তু কাজে লাগাচ্ছিস্ না।'

তুমি ঠিক করলে আর নেশা করবে না। মনে মনে বললে, 'হ্যাঁ, এখন থেকে আর যাব না।' আবার যেই মদের দোকানের কাছ দিয়ে গেলে, 'ঐ নে তো রে।' নেশায় ডুবে গেলে। চেতন কিন্তু বলে যাচ্ছে, 'আরে, ঐ কি করছিস্? আরে, ঐ কি করছিস্? আবার নেশা করছিস্?'

চেতন তোমাকে প্রতিক্ষণে জানিয়ে দিচ্ছে, সচেতন করে দিচ্ছে।

তবে? এমন সুন্দর cheque দিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছা করলে তুমি ভাল কাজ করতে পার, নাও করতে পার। কাউকে মারতেও পার, রক্ষা করতেও পার। নিশ্চয়ই, স্রষ্টা স্বয়ং দিয়েছেন নিজহস্তে। তিনি বলছেন, ইচ্ছা করলে তুমি নিজেকে মারতেও পার; ইচ্ছা করলে নিজেকে রক্ষা করতেও পার। এই ক্ষমতা আমি তোমায় দিয়ে দিলাম। এই will (উইল) আমি করে দিলাম। আমারও ক্ষমতা নাই, এটা ফিরিয়ে নেওয়ার। সাথে দিলাম তোমাদের রক্ষা করার জন্য সাথী। তাকে (মনকে) বাহন করে তোমরা যেথায় খুশী সেথায় যাবে। যেখানে যেখানে মন বিরাজ করতে পারছে, সেই পর্যন্ত তোমার গতি বা রাস্তা। সেটা তোমার দিগ্‌দর্শন, তোমার পথের নিদর্শন। তুমি যে কোথায় কোন্ পর্যন্ত যেতে পার, কি করে বুঝবো আমরা?

আমরা stamp দেখে বুঝি, এটা রাশিয়ার stamp, এটা লণ্ডনের stamp, এটা চায়নার stamp. Stamp দেখে বুঝা যায়। ঘরের মধ্যে stamp কোথা থেকে এসেছে, খাম দেখে, (খামের উপরে লাগানো stamp দেখে) বুঝছি। এটা From London, এটা From Russia, এটা From China. কি করে বললাম? ঐ যে চেক (cheque) আছে, stamp আছে।

তা আমাগো (আমাদের) যে stamp দিল, যে হাতীটা (মন) দিয়েছে, যে বাহনটা দিয়েছে, সেই বাহনটায় দেবতা এমনি এমনি চড়ে বেড়াচ্ছেন? অমন বাহনকে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। আরে বেটা, আমরা সবাইতো এক বাহন চড়েই আসছি। আমাদের বাহনরে আমরা দেব না খাওয়া, তারে দেব বাড়ি (আঘাত), তাহলে কি করে হবে?

আমরা যে বাহন (মন) চড়ে আসছি, সেই বাহনটা কি? সেই বাহনটার ক্ষমতাটা কি? সেই বাহনটার দৌরাত্ম্যটা কি? ছেড়ে দে দেখি। দেখি কি, চন্দ্র সূর্য তার (মনের) কাছে এক পা, দুই পা। সমস্ত গ্রহগুলি দশ পা। অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বের অগণিত গ্রহগুলি তার (মনের) দশটি পদক্ষেপ। তার পা কিভাবে কাজ করতে পারে, ভাবো তো দেখি। তুমি যে মনটাকে বাহন করে এসেছ, তার গতিটা কত বড়, কত বিশাল,

সেটাই তো বলছে। মহাশূন্যের অগণিত গ্রহ, কোটি কোটি বছরেও যেগুলি গণনা করে শেষ করা যায় না, মন বলছে, 'আমি দশ পা বের করলেই (এগোলেই) সব ঘুরে আসতে পারি।' তারপরে? তারপরে আরও আছে। **দশ পা, বিশ-পা-এর মধ্যেই যখন সমস্ত গ্রহ ঘুরছে, সেই মন যখন এত বড়, এত বিরাট, সেইটাকে যে বাহন করে আসছো, বাহন করে চলছো, তাহলে তুমিও নিশ্চয়ই সেখানে যেতে পার।** নিশ্চয়ই সেইটা (বাহনটা) যেখানে যেখানে যাবে, উইল (will) করা আছে, শর্ত্ত দেওয়া আছে যে, তুমিও সেইখানে সেইপর্যন্ত যেতে পারবে। সেটাই ইঙ্গিত স্বরূপ তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

কি করে বুঝবো নিজেরা যেতে পারে। যাওয়া যায় যে, কি করে বুঝবো? আমি যেতে পারবো, সেইটা কি করে বুঝবো?

দেখ, গরুগুলো যখন পিঠ চুলকায়, তখন কি পা দিয়ে পিঠ চুলকায়? তখন লেজটা দিয়েই বাড়ি দিয়ে দিয়ে পিঠ চুলকায়। তার যে চুলকানি আছে বা চুলকানি হতে পারে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে চুলকাতে পারে, সে যে চার পা দিয়ে চুলকাতে পারবে না; তাই লেজটা দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিয়েই চুলকানিটা মিটায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গরুর শরীরে লেজটা এমনই জিনিস, প্রকৃতি থেকে তাকে এমন জিনিস দিয়ে দিয়েছে যে, চুলকানি ও অনেক কিছু থেকে লেজটা তাকে রক্ষা করে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার চলাফেরায়, তার গতিতে লেজ তাকে অনেক কিছু থেকে রক্ষা করে। সৃষ্টির নিয়মে তার চলাফেরায় গরু কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে, লেজটা দিয়ে তাকে অনেক কাজ করতে হয়। লেজ তাকে অনেকভাবে রক্ষা করে। তোমরা কি বোঝ না? গরুর গতিবিধি, চলাফেরায় কি বুঝে উঠতে পার না যে, মশা-মাছি যখন উৎপাত করে, লেজটা দিয়ে সে এমন-ওমন করছে। দেখলেই বুঝা যায়, বলুক বা না-বলুক, ভাবে ভঙ্গীতে চলাফেরায় বুঝা কি যায় না?

এটা বুঝতে গেলে কি বলতে হয়, 'গরু মশাই, আপনি লেজটা দিয়ে এমন-ওমন করছেন কি কারণে?' এমন কথা কেউ বলে? জিজ্ঞাসা করে কেউ?

মনটাকে তেমনই জিজ্ঞাসা করার কি কোন প্রয়োজন হয়? **মনটা ঐ যে নাড়াচাড়া করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, যে পর্যন্ত নাড়াচাড়া করে, সেই পর্যন্ত তোমার অবাধ গতি।** সেই পর্যন্ত তোমার গতি না হলে, অযথা সৃষ্টির নিয়মে ঐ পর্যন্ত গরুর লেজও যেত না, মনও দৌড়াদৌড়ি করতো না। প্রকৃতির নিয়মে তোমার প্রয়োজনের বাইরে, একটা কণা এদিক ওদিক করে না।

মন যে এদিক ওদিক ঘুরছে, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীতে যেখানে খুশী যাচ্ছে, সেখানে নিশ্চয়ই তোমারও গতি আছে। সেখানে অবাধগতি আছে বলেই সে চলছে, ফিরছে, ঘুরছে, এদিক ওদিক করছে। তোমাকে জানাচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে তোমাকে জানাচ্ছে যে, তোমার গতিও সেখানে আছে। কারণ অযথা সে যাবে কেন? প্রয়োজন তো নাই এত ঘোরাঘুরির। সৃষ্টির নিয়মে প্রয়োজন ছাড়া কিছু নয়।

মন তোমাকে ইঙ্গিত দিচ্ছে; সমস্ত বিশ্বে যেথায় খুশী সেথায় তুমি অবাধে যেতে যে পার, সেটাকে জানিয়ে দিচ্ছে। সেকথা বলেই শেষ করছে না। সেকথা বলেই বলছে, তুমি দেখ, তুমি যেইভাবে এসেছ, যেইভাবে সেই মাতৃগর্ভের থেকে পৃথিবীর এই পর্যন্ত যে এসেছো, তুমি সূক্ষ্মগতির ভিতর দিয়েই এসেছো। সেই রক্ত থেকে, বাতাস থেকে, আলোর থেকে, সেই গতির ভিতর দিয়েই তো এসেছো। গতি অনুযায়ী যদি তুমি এসে থাক, সেই গতির মধ্যে তুমিও তো ছিলে। সেই গতিতে তুমি ছিলে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই গতিতে এতটুকু হতে হতে, হতে হতে আজ এই যে তুমি হাতী হয়েছ, এতবড় হয়েছ, সেই গতিতে যখন তুমি ছিলে, তোমার লেজটা, তোমার মনটাও বিরাট হবে। তোমার সেই সূক্ষ্ম গতিটাও বিরাট। গতির মধ্যে তখন যেমন তুমি বাতাসে ছিলে বা আলোতে ছিলে, মাটিতে ছিলে, খাদ্যে ছিলে, রক্তে ছিলে, তুমিইতো ছিলে একদিন। তারপরে **যখন রক্তে, বীর্যে পৃথিবীতে এলে, সেইগুলো দিয়েই তো তুমি। তুমিই যখন সেগুলো, তোমার ভাবনাটাও তো সীমাহীনের পথে, সূক্ষ্মের পথে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, চলে যাবে। যাবে না কেন? বাতাস চলে যায়, আলো চলে যায়। তাহলে মনটা তো**

সবটার scent, মনটা যাবে না কেন?

ফুলটা এইখানে থাকে, গন্ধটাতো অনেকদূরে চলে যায়। ফুলটা কি এতবড়? ফুলটা কি পৃথিবী থেকেও বড়? বাতাসে ভাসতে ভাসতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপরমাণুর ভিতর দিয়ে গন্ধটা কি পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে যায় না? তাহলে? একটা ফুল এতটুকুনু, এখানে ফুটলো; তার গন্ধটা কতদূর চলেগেল। গন্ধটা যতদূর যায়, ফুলের সত্তা ততদূরে সেইখানে না গেলে, গন্ধটা কি করে যায়? একটা ফুল যখন ফুটলো, মনে কর, তার গন্ধটা ১০ মাইল দূর পর্যন্ত গেল। ১০ মাইল দূরে নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা গেছে, ফুলের সত্তা নিশ্চয়ই সেখানে গেছে, নাহলে গন্ধ কি করে পাবে? বাতাসে বাতাসে যেভাবেই হোক, এমন কিছু সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু গেছে যে, তার সত্তা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। সত্তা সর্বত্র রয়েছে।

চেতন তোমাকে কি বলছে? তোমাকে বলছে যে, সর্বত্র বিরাজ করার মতন ক্ষমতা তোমার আছে। তোমার মনের যে scent, সেই scent-টা সর্বত্র বিরাজ করছে। বিরাজ যে করে, এই কথাটাই জানিয়ে দিচ্ছে। মন চেতনকে বলছে। চেতন তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি চেতন, আমি সচেতন। আমার scent-টা সমস্ত বিশ্বে, অনন্তময় বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে গন্ধ, মনের সুগন্ধ (ধ্বনির সাথে সাথে) সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে। তাতে কি হয়েছে? সবাইকে সজাগ করছে। আমার সেই গন্ধে সেই ধ্বনিতে আমিও সজাগ হচ্ছি। সর্বত্র সেই গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে কোন পরিচয় হচ্ছে না। তখন একথা বলছে, গন্ধ যে পর্যন্ত যাবে, চেতন সেখানে গিয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। মনের scent-এর সাথে সাথে সচেতন সেখানে যাচ্ছে। সচেতন যদি সেখানে যায়, তুমিও সেইখানে গেলে। চেতন না থাকলে তুমি কে? তুমি তো পড়ে থাকবে। চেতন বলছে, গন্ধ (scent) যেখানে যায়, সেখানে আমি আছি। কারণ গন্ধ যারা যারা গ্রহণ করছে, সবাই তো সচেতন। সমস্ত সচেতনওয়ালারাই এই সুগন্ধ গ্রহণ করছে। আমার এই scent, আমার এই সুগন্ধ যদি সমস্ত সচেতনওয়ালারাই গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সেখানে সেখানেই আমিও রয়েছি বর্ত্তমান। কারণ আমার

scent-এর সাথে সাথে, আমার মনের গতির সাথে সাথে আমার সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দূর থেকে ফুলের গন্ধ পেয়ে প্রত্যেকেই বলে, কি সুন্দর গোলাপ ফুলের গন্ধ। কি সুন্দর এই মধুময় গন্ধ। ফুলটি সামনে না থাকলেও গন্ধের সাথে সাথে ফুলের সত্তা সেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আমার scent, আমার মনের scent যদি প্রত্যেক সচেতনওয়ালা টের পায়; তারা টের পাওয়া মানেই, আমিই প্রকারান্তরে টের পেলাম। আমারই একটি রূপ, বুঝতে পেরেছ কথাটা? আমারই একটি রূপ, আমারই scent, আমারই প্রতিনিধিস্বরূপ সেখানে রয়েছে। আরেকজন এই গন্ধ (আমার scent) ৫০ মাইল দূর থেকে পেয়েছে। আরেকজন ৫০ কোটি মাইল দূর থেকে পেয়েছে। পাচ্ছে কে? আমারই মতন সচেতনওয়ালা, আমারই মতন চেতনওয়ালা, আমারই মতন প্রকৃতির সেই চেক যারা যারা গ্রহণ করেছেন, তারাই পেয়েছেন, তারা পাচ্ছেন। তারা পেয়েছেন, তাদের পাওয়া মানে কি? তারা পেলে, তোমার পাওয়া, এক কথা। তারা যদি পান, তাহলে তোমারই পাওয়ার মতন হল। এতদূর থেকে কি করে পায়? হ্যাঁ, প্রত্যেকটি চেতনওয়ালা যারা পাবে, প্রকারান্তরে তোমার চেতন এবং সচেতন সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। তারা (তোমার চেতন এবং সচেতন) তখন সেখানে সেখানে সজাগ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি জায়গায় যে চেতন (চেতনওয়ালা) তোমার scent গ্রহণ করবে, সেই প্রত্যেকটি পৃথিবীতে তুমি যাচ্ছ। সেই প্রত্যেকটি পৃথিবীতে তোমারই সত্তা যায়, মন যায়।

তুমি যে সেখানে চলে গেলে, এটা প্রমাণিত হবে এইভাবেই যে, তুমি এই আলো বাতাসের পথ দিয়ে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপরমাণুর পথ দিয়ে এসেছ তো। এই পথ দিয়ে এসে এসেই তো জন্মগ্রহণ করেছ। সুতরাং তুমি সেইপথ দিয়ে আবার চলে যেতে পারবে। এখন সেইপথ দিয়ে যে যাবে, কিভাবে যাবে? মন তো চলে গেল। তুমি তো পড়ে রইলে। তুমি তো এইখানে আছ। মন তো কোথায় কোথায়, কতদূরে চলে গেল।

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো, 'আমি কি করে যাব?' কেন যেতে পারবে

না? মন যখন যায়, তখন বস্তু আকার নিয়েই যায়। সে (মন) যখন যায়, তার চেতন নিয়েই যাচ্ছে; তোমাকে আশ্রয় করেই যাচ্ছে। সে (মন) যখন যাচ্ছে, তোমাকে তোমার সত্তাকে আশ্রয় করেই যাচ্ছে। তুমি স্মরণ করছো যে, মন যাচ্ছে। কিন্তু স্থূলভাবে সেটা এমনি করে পাচ্ছ না। আবার পাওনি বলে যে, একেবারে পাও না, ঠিক তা নয়। চেতন তোমাকে বলছে, 'ও' (মন) যখন যেতে পারছে, তাহলে আমিও যেতে পারবো। এইটাই স্মরণ করিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাকে সে সজাগ করে দিচ্ছে। সজাগ করতে গেলেই, সজাগ হতে গেলেই তখন তোমাদের করণীয় কি?

ফুল যখন ফোটে, গন্ধ বেরোতে বেরোতেই ফুল শুকিয়ে যায়; তার সত্তা বিলীন হয়ে যায়। **এই পৃথিবীতে যা বস্তু, যত বস্তু দেখছো, বস্তু বেরোতে বেরোতেই কর্পূরের মতো (তার সত্তা) বিলীন হয়ে আপন সত্তায় মিশে যাচ্ছে। তোমার এই মন যেতে যেতে, যেতে যেতে বিলীন হয়ে যাবে। যেইরূপেই তুমি রূপান্তরিত হও না কেন, একদিন বিলীন হয়ে যাবে।** মহাশূন্যের অনন্ত শক্তিতে ভরপুর হয়ে গেলে, আবার ঠিক এই অবস্থায় বা যে কোন অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে।

আজ তোমরা যে অবস্থায় আছ, মনকে চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত ব'লে মনে করছো; এটা মনের বিরাট রূপ, ব্যাপকতারই রূপ— চঞ্চলতার রূপ নয়। মন আকাশ-বাতাসের মতো, জল ও আলোর মত ব্যাপকতায় রয়েছে বলেই মনে হয় মন চঞ্চল; কিন্তু এটা চঞ্চলতা নয়। এটা মনের বিশালতারই পরিচয়। তাইতো মনকে কখনও স্থির করা যায় না। মনের এই যে বিক্ষিপ্ততা, এটাই হচ্ছে প্রকৃতির প্রকৃতস্থ রূপ। অগণিত সৃষ্টির জন্য যেই মন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাকে বিশেষ কোন কিছুতে আটক করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই।

বস্তুর বস্তুত্ব ও তার তত্ত্ব ভাবতে ভাবতে যখন নিজের মাঝে নিজে নিবিষ্ট হয়ে যাবে, তখন দেখবে মন তার উপযুক্ত খোরাক পেয়ে বিরাট চিন্তার সাথে মিশে যাবার প্রচেষ্টায় কি বিরাট শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। সেই ভাবনার মাঝে ভাবময় হয়ে, শূন্যের চিন্তায় শূন্যময় হয়ে

যখন বিলীন হয়ে যাবে, তখন বুঝবে কি বিরাট শক্তি এই মনের। এই বিরাট শক্তির সাড়া যে পাবে, তার মাঝেই প্রকৃতির প্রকৃত শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু কিভাবে কি করলে মহাশূন্যের অনন্ত শক্তিকে আয়ত্ত করা যাবে? প্রকৃতি বলছেন যে, সেইটাই হচ্ছে ধ্বনি, সেইটাই হচ্ছে সুর। সেই সুর বা ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তবেই পাব সঠিক পথের সন্ধান। মন যখন যায়, তখন বস্তুকে আশ্রয় করে, ধ্বনিকে আশ্রয় করেই যায়। ধ্বনিকে আশ্রয় করলেই ধ্বনি ধ্বনিত হবে, শব্দ হবে। সেই ধ্বনিকে আশ্রয় করে মন চলতে থাকে। সেটাকেই সহজভাবে সহজ পথে আনলেন সমস্ত ঋষিরা। বেদ হচ্ছে মহাশূন্য; বেদ হচ্ছে মহাকাশ; বেদ হচ্ছে জ্ঞান; বেদ হচ্ছে বিচার; বেদ হচ্ছে বিবেক; বেদ হচ্ছে সূর্য। সমস্ত বেদ বেদান্তকে মন্থন করে ঋষিগণ চিন্তা করে ঠিক করলেন, কিভাবে কোন্ ধ্বনিকে অবলম্বন করে, আমরা মনের সাথে পাল্লা দিয়ে, মনকে বাহন করে, ওকে (মনকে) উপযুক্ত খাদ্য দিয়ে, ওর গতির সাথে সাথে (আমরা) এগিয়ে যেতে পারি? কোন্ শব্দ, কোন্ ঘরাণা, কোন্ সে ডাক, যে ডাকে আমরা সেই সাড়া পাব?

এখানে দিবারাত্র নানা শব্দ করছো, তাতে কি এগোচ্ছ না? এগোচ্ছ। কিন্তু এগোতে গেলে সময় সময় আবার পিছিয়ে যেতে হয়। এমন সমস্ত শব্দের ব্যবহার হয়, আমি যতটা এগোই, ততটা আবার পিছাই। কিন্তু ঘরাণার যে শব্দ, তার গতি অনেক বেশী। ঢিল তো ছুঁড়ছো। কতদূর যায়? খুব বেশী হলে ১০০ হাত। কিন্তু বারুদের মধ্যে ভরে দিলেই তো যায় ৯ মাইল/১০ মাইল। এতটুকুই তো। বারুদ ভরে ঠুস্ করে একখান টোক্কা দেয়। টোক্কাটা দিলে তো দেখি, 'গুরুম্' করে শব্দ হয়, আর যায় গিয়ে একেবারে ১০ মাইল। যায় কি করে? এতটুকু বারুদের কি শক্তি। এতটুকু বারুদ। সুতরাং শব্দ তো অনেক। ঐগুলি দূরে যাওয়ার মতন নয়। এই এখান থেকে ১ পদ/২ পদ যায়। কিন্তু এই শব্দগুলিরেই বারুদের মধ্যে ভরে যদি দেও, মনের লগে লগে (সাথে সাথে) দৌড়াবে। ঝন্ ঝন্ করে মন চলে যাবে; তোমার ঐ শব্দও

(ধ্বনিও) সাথে সাথে যাবে। সেইটাই হচ্ছে আসল। সেইটাকে অতি সহজ করে দেওয়ার জন্য, ঐ হাতীরূপ মনের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য সমস্ত তত্ত্বজ্ঞরা, ঋষিরা চিন্তা করতে শুরু করলেন। তারা জানেন, সৃষ্টির নিয়মের থেকেই তারা এটা পেয়ে যাবেন। কারণ জিজ্ঞাসা যেমনই আসে, মীমাংসাও আবার সেভাবেই পাওয়া যায়।

তখন সমস্ত ঋষিরা বসে বসে চিন্তা করতে শুরু করলেন। সেখানে দেবর্ষি ছিলেন, শিব ছিলেন, বিষ্ণু ছিলেন। আরও সব বড় বড় তত্ত্বজ্ঞরা ছিলেন। তাঁদের সকলের নাম জানাও নাই। বহু নাম অজানা রয়েছে। তাঁরা কি করলেন? কিভাবে অতি সহজে এই স্বল্পায়ু জীবের দেশে জীবগণকে সেই বিরাটের পথে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সর্বত্র বিরাজ করতে পারা যায়, তার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন, 'সর্বত্র আমরা কি করে মনের সাথে একত্র হয়ে একসুরে চলে যেতে পারি? কোন্ সুর অবলম্বন করলে সেটা করতে পারা যায়? এরকম পথ কোথায়?' তখন দেবর্ষি বিষ্ণু এবং শিবের কাছে গেলেন, 'প্রভু, কি করে এতবড় হাতীর (মনের) রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়? তার ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই আছে। একটু ব্যবস্থা তো করা দরকার'।

মধুর হেসে শিব এবং বিষ্ণু বললেন, 'ব্যবস্থা? পোঁত, পোঁত (বপন কর, বপন কর), পুঁতে যাও। সব ক্ষেতের (দেহক্ষেত্রের) মধ্যে বীজ (বীজ মন্ত্র) পুঁতে দাও। তাতে গাছ হবে, ডালপালা হবে, ফুল ফল সব হবে। তারপর হাতীকে ছেড়ে দাও। হাতী খেয়ে নেবে। তার ক্ষুধা নিবারণ হবে।'

— প্রভু, বীজ ছড়ালেই হবে?

— হ্যাঁ, ছড়িয়ে দাও। ছড়িয়ে দাও। আর কিছু নয়, বীজ ছড়িয়ে যাও।

এই বীজই হচ্ছে নাম। তখন দেবর্ষি করলেন কি দেহক্ষেত্রে বীজ ছড়াতে শুরু করলেন।

—শিব বললেন দেবর্ষিকে, আর সময় নষ্ট করো না। বীজ ছড়িয়ে যাও। তোমার দেহবীণাযন্ত্রে মূলাধার থেকে সহস্রারে বাজাও সেই নাম, রাম নারায়ণ রাম।

—বিষ্ণু বললেন, মন তার খোরাক পাবে এই নামে। দেবর্ষি, তুমি দেহবীণাযন্ত্র বাজাও।

তখন মূলাধারের মূলগ্রন্থিতে সুর দিতে আরম্ভ করলেন দেবর্ষি। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে দেহবীণাযন্ত্রের এই সপ্তচক্রে সুর বাজাতে লাগলেন। বাজাতে বাজাতে দেবর্ষি জীবগণের মাঝে ছড়াতে আরম্ভ করলেন, এই মুক্ত বীজ, মুক্ত নাম, মহানাম রাম নারায়ণ রাম। তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, ''হে জীবগণ, কর্ত্তব্যকর্ম করার মধ্যে করে যাও অবিরাম রাম নারায়ণ রাম।' তোমাদের দেহবীণাযন্ত্রে যদি বাজাও এই মহানাম, তবেই পাবে মুক্তিপথের সন্ধান''।

সুতরাং তোমাদের বেশীদূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আজ্ঞাচক্র হতে সহস্রারের সহস্র ধ্বনিতে বলো, 'রামনারায়ণ রাম।' যেভাবে খুশী বলো, কোন ক্ষতি নাই। যেইভাবে সেইভাবে বলো, কোন চিন্তা নাই। শুধু দেহবীণাযন্ত্রে বলো, 'রাম নারায়ণ রাম।' এই হ'ল মনের সেই খোরাক, যেখানে শব্দে, ধ্বনিতে ধ্বনিতে ব্যাখ্যা রয়েছে অনন্ত। অনন্ত ব্যাখ্যার সাথে অনন্ত বর্ণবোধ আছে এই শব্দধ্বনিতে। এই ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করলে সেই ব্যাখ্যাগুলো এসে সম্মুখীন হয়। সাথে সাথে মনের খোরাক মন আপনিই পায়। তার থেকে রসাস্বাদ গ্রহণ করে। এই 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের ব্যাখ্যার শেষ নাই। যার বর্ণনার শেষ নাই; তার কোনকিছুরই শেষ নাই। এই শব্দধ্বনি যদি অবিরাম অবিরত সর্বাবস্থায় বারবার বলো, তখন মন বলবে, 'বাঃ, এই তো আমি আমার খোরাক পাচ্ছি। আপনমনে সেই মন তখন তার রসাস্বাদ গ্রহণ করতে থাকবে। অনন্ত তৃপ্তিতে ডুবে যেতে থাকবে। তুমিও তখন সেই তৃপ্তির সুর খুঁজে পাবে। এমন বিরাট ধ্বনি, বিরাট শব্দ আর নেই। কীর্তনের সাথে সাথে সকলের সঙ্গে সমসুরে ধাপে ধাপে আপনসুরে আপনি যদি তুমি এই মহানাম করো, বারবার করে যদি বলো, 'রাম নারায়ণ রাম', 'রাম

নারায়ণ রাম', 'রাম নারায়ণ রাম', মন তখনই তার থেকে নিয়ে নেবে সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের খোরাক। তাই দিবারাত্র সর্বসময় সকল অবস্থায় বলো, রাম নারায়ণ রাম।

শিব বলো, বিষ্ণু বলো যারা আজ পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবান হয়েছেন, বিরাট হয়েছেন; এই সুরকে নিয়েই, এই সুরের সাধনা করেই তাঁরা সুরময় হয়েছেন, দেবতা হয়েছেন। তাই আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারে মনোনিবেশ করে গভীর সুরে বলো, রাম নারায়ণ রাম। হে পথিক, মহাশূন্যের যাত্রিক, পাথেয় সঞ্চয় করো। তবেই পাবে প্রকৃতির প্রকৃত পথের সন্ধান। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

প্রদীপ জ্বলছে, নিভছে, কে নিভালো? কোথায় গেল? সেটাই আকাশ, সেটাই মহাকাশ

২১শে আগষ্ট, ১৯৬৬
পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা

যে মন আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে, এই মনের অবস্থা কি রকম জান? ঠিক বাতাস যেরকম, আকাশ যেরকম, সূর্যের তাপ যেরকম, খালি জায়গা যেরকম, মনও সেরকম। **মন এমন বস্তু খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার সে (মন) কিরকম করে থাকে? সে থাকে নিজস্ব সত্তায়, যে সত্তায় সে জাগ্রত। আবার সে যখন নিজেকে নিজে খুঁজতে যায়, দেখে সর্বত্র।** সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহের সমস্ত অংশ খুঁজলেও কিন্তু যেই সত্তা দেখে, যেই সত্তা শোনে, সেই সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে অবস্থায় সে সচেতন, তার কোন অবস্থায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার সবটা যোগ দিলে খুঁজে পাওয়া যায় যে, তিনি আছেন।

মনটি যেরকম ধারায় রয়েছে, তার সত্তা সবসময় প্রদীপের শিখার মত প্রজ্জ্বলিত অবস্থা। এই যে মনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থা, এই যে মনের বিকাশ, তার জ্ঞান, এটাও একটা ধারা। এ ধারা আবার মনেরই ধারা। আবার চৈতন্য একটা ধারা, দেহও একটা ধারা। সবই মনের ধারা। মন একাধারে বুদ্ধি, একাধারে জ্ঞান, একাধারে বিচার। যেই মন হতে এত ধারা প্রবাহিত হয়েছে, সেই মন তবে কোন্ ধারাতে আছে? মন এমন একটি ধারাতে রয়েছে, যেখানে কোন উপাধি দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করে বিচার করা চলে না। মনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাকে বুদ্ধি বলে বলা যায় না, জ্ঞান বলে বলা যায় না। আবার সবকিছু বলা যায়।

মনটার আকার কি? মনের আকারটা হচ্ছে আকাশ, যাকে খুঁজে

পাওয়া যায় না; যার সীমা নেই। মন হচ্ছে আকাশের মত। আকাশকে যদি মন বলা যায়, তাতে আপত্তিও থাকে না। মনের রূপ নেই, গন্ধ নেই; মন আকাশময় হয়ে রয়েছে। সেই আকাশে কি আছে? সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, গ্রহ উপগ্রহ আছে। এটা আকাশস্থিত রূপ। তাকে অন্য যে কোন রূপে ব্যাখ্যা দিলে ছোট করা হয়। তাকে জ্ঞান বললে ছোট করা হয়। সে কোন আখ্যায় থাকবে না। সে কোন ব্যাখ্যায় যাবে না। যে কোন বর্ণনাতে রাখলে তাকে অতি ছোট করা হয়। চৈতন্য বললে ছোট করা হয়। কাজেই সে আকার বিহীন। আকাশের রঙ নীল। আকাশের রূপ নেই বলেই আকাশ নীল হয়ে গেছে। আবার তার এতরূপ, এত বর্ণ— গুণে শেষ করা যায় না। আমরা কত রূপের বিন্যাস, কত রূপের ব্যাখ্যা করছি। এখানকার আবহাওয়া, আরও কত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করি। কিন্তু আকাশতত্ত্বের কথা কেহ বলে না। সেই তত্ত্ব বড় তত্ত্ব, বড় নিগূঢ় তত্ত্ব। **আকাশের যে আকাশস্থিত রূপ, তাকে খুঁজতে গেলে যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, মনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আকাশই মন।**

মনটা আকাশ হল কেন? আকারবিহীন রূপই মন। সেটা বুদ্ধি নয়, চৈতন্য নয়, জ্ঞান নয়, বিচার নয়। মন এমন অবস্থায় রয়েছে, চিরকাল চিরযুগ ফাঁকা অবস্থাই মনের অবস্থা। এই শূন্যময়ের অবস্থা বর্ণনা করে মনটা কি করলো? আকাশের কথা বলতে গিয়ে অনুভূতির রাজত্বে পৌঁছে দিল। আকাশ ধীরস্থির, তার রূপ নেই, বিন্যাস নেই, আকার নেই। এটা অদ্ভুত রূপ। কারণ তার বিন্যাস নেই, আবার বিন্যাস আছে। যার আকার নেই, তার আকার আছে। যার রূপ নেই, তার রূপ আছে। **প্রদীপ নিভছে, জ্বলছে। কে নিভলো? কোথায় গেল? সেটাই আকাশ সেটাই মহাশূন্য। সেটা একটা অবস্থা। বিলীনের মাঝে লীন হয়ে যাওয়াই আকাশ। মন যখন মনন করছে, মন যখন ধীরস্থির হয়ে, অচল অটল হয়ে, নিজের মধ্যে নিজে স্থিত হয়ে জপ করছে, ধ্যান করছে আকাশের মত করে, মন তখন আকাশময় হয়ে গেছে।** পাহাড়, পর্বত, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস তাদের নিজস্ব সত্তায় নিজস্ব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধীরস্থির হয়ে। ধীরস্থির হবার জন্যই সবাই নির্দেশ করছে। আকাশে স্থিত হয়ে, আকাশ থেকে সৃষ্ট হয়ে মনটা যে আকাশময়

হয়ে রয়েছে, এই অবস্থা চিরকাল রয়েছে। এটা ধ্যান বা যোগ বা নির্বিকল্প অবস্থা। এমন ধ্যানে রত হয়ে, সমস্ত বিশ্লেষণের ঊর্দ্ধে থেকে, আপন সত্তায় আপনভাবে বিরাজমান হয়ে মন এমন একটি রূপের পরিচয় দিচ্ছে, যার পরিচয় হচ্ছে এই জগৎ। **আমরা যে আকাশ থেকে এসেছি, তার পরিচয়, মৃত্যুর পর খুঁজে পাওয়া যায় না। কে শোনে খুঁজে পাওয়া যায় না। কে বোঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। কে কোন্ সত্তায় রয়েছে, খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খুঁজে না পাওয়ার অঙ্গই হচ্ছে আকাশস্থিত অবস্থা।** এই আকাশস্থিত অবস্থায় থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাল্‌বগুলি জ্বলে উঠছে। দেহের সমস্ত শিরা উপশিরাতে আকাশস্থিত মন রয়েছে বলেই আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশ দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ বুঝে নিচ্ছে; অনুভূতি দ্বারা আপন সত্তা বুঝে নিচ্ছে, যে সত্তা আকাশস্থিত হয়ে রয়েছে। আপন সত্তায় দেহের অনুপরমাণু সেই অবস্থায় বিরাজ করছে বলেই আমাদের দেহের সমস্ত অংশে শিরায় উপশিরায় সেই আকাশস্থিত জ্ঞান বুদ্ধি বিচারের ধারা বয়ে যাচ্ছে। মন সেই ভার বহন করবে। কোন ভার বহন করবে? আকাশস্থিত মন কেমন ধীরস্থির হয়ে সর্বত্র মানিয়ে নিয়েছে, যে কোন অবস্থায় সবকিছু তার সমতুল্য করে নেবার চেষ্টা করছে। আকাশমন যখনই মনন করে, শঙ্খধ্বনি আসে। সেই অবস্থায় মন ধীরস্থির থাকে।

মনন করছে বলেই মনন শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। যে ইচ্ছা মনে মনে করে নেওয়া হচ্ছে, তাতে যুক্ত আছে বলেই আবার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সমস্ত বস্তুর বস্তুত্বের মধ্যে মনে হয় ভালবাসা আছে, আকাঙ্খা আছে, আন্তরিকতা ও তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা আছে। এই যে অবস্থা, তাতে সেই অবস্থাকে নিবারণ করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই আকাশস্থিত মন এগিয়ে চলেছে আপনসত্তায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে ধাবিত হচ্ছে আকাশকে পূরণ করার জন্য। কিন্তু এই ফাঁকা জায়গা কোনদিন পূরণ হয় না। আবার **এই ফাঁকা জায়গা একটা বাঁধনে রয়েছে, একটা আকর্ষণে রয়েছে। সেই ফাঁকাকে পূরণ করার জন্য জগৎ ধাবিত হচ্ছে। আমরাও যদি তারজন্য ধাবিত হই, তবেই আমাদের মধ্যে সুর দেবে। এই অবস্থায় চলছে সমস্ত সত্তা বুদ্ধি বৃত্তি। যদি আমরা নিজেকে**

মিশিয়ে দিই নিজস্ব সত্তায়, তবেই হবে একমাত্র সাধনা, তবেই হবে একমাত্র সিদ্ধি। সেই আকাঙ্খাতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সেই আকাঙ্খাতে জগৎ পূরণের সুরে পূর্ণ হবার সাধনায় ধাইছে।

আকাশ নিজে কি চায়? সেই আকাঙ্খায় যদি আমরা অগ্রসর হই, তবে একটি অবস্থায় উপনীত হই। আমাদের চিন্তাধারা সর্বদা সেই ফাঁকা জায়গার কথা বলে। আমরা সেই নামের ভিতর দিয়ে সেটাকে খুঁজে পাব। কারণ প্রকৃতি সেই ভাবেই চালিয়ে নিচ্ছে। এটাই ধীরস্থির অবস্থা। এটাই প্রকৃতির প্রকৃতিগত নিয়ম। আকাশ সেইভাবেই গতির পথে গতিময় হয়ে রয়েছে।

তোমরা জপের ভিতর থাকবে। তোমরা তৈরী হয়ে থাকবে। বৃহৎ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ব্যাপকভাবে সন্তানদলের সঙ্গে সহযোগিতা করো। এরা চাইছে, আমার এই সাপ্তাহিক বাণীগুলি ছোট ছোট বই করে যাতে বাইরে সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এখানে বাধ্যবাধকতা নেই। আমার খাটুনিটা যাতে একটু কমে তার চেষ্টা করছে। সামান্য দুটো টেপ নেওয়াতে নর্থ বেঙ্গলের জায়গায় জায়গায় শুনাচ্ছে। যারা শুনছে, সকলে কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। দেখ, দুটো টেপেই কত কাজ হচ্ছে। তোমরা যদি চারিদিকে ছড়াতে পার, সবাই শোনার সুযোগ পাবে। দূরে যারা রয়েছে, তোমাদের ভাইবোনেরা, তাদের সাথে নিজেরা যোগাযোগ করবে। তোমরা নিজেরা এগিয়ে এসে বেদের কাজ করবে। ট্রামে, বাসে, ধুঁয়ায় কত পয়সা যায়। সেই পয়সা বাঁচিয়ে অনেক কিছু করা যায়। সন্তানদল খুব চেষ্টা করছে।

তোমরা এগিয়ে এসো। কত পয়সা ধুঁয়ায় যায়। যাতে কাগজটা চলে, টেপটা চলে তার চেষ্টা করা উচিত। কত আশ্রমে,কত জায়গায় কত সুবিধা। আর এখানে তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে বাবার কথা শুনছো। এই টেপে কত জায়গায় শোনানো যায়। একটা লেকচারে (ভাষণে) যা তোমাদের দিচ্ছি, ওটা যদি ছড়িয়ে যায়, দেশে বন্যা বয়ে যাবে। আমার পরিশ্রম লাঘব হবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) শৈবাল ঘোষ, সালকিয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩১৫৪২৯৯৫
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
১০) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১১) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
১২) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১৩) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৪) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৫) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৬) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কুচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
১৭) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৮) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৯) মধুসূদন মুখার্জী, পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৯৩২৩৬৮৩৭৮
২০) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
২১) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
২২) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২৩) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৬) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫